বিষকন্যা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

তিন টাকা

চতুর্থ সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৬৩

বিষকন্যা

চন্দন-মূর্ত্তি

১

বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিতে যে চিত্রটি আমাদের মনে উদয় হয়, একালের সাধারণ বাঙালীর চেহারার সঙ্গে সে-চিত্রের মোটেই মিল নাই। অথচ, যাঁহার কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি সেই ভিক্ষু অভিরাম যে কেবল জাতিতে বাঙালী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহার চেহারাও ছিল নিতান্তই বাঙালীর মত।

আরম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে ভিক্ষু অভিরামের আগাগোড়া জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়, থাকিলেও তাহা সম্ভব হইত না। তাঁহার বংশ বা জাতি-পরিচয় কখনও শুনি নাই, তিনি বাঙালী হইয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে কি করিয়া গিয়া পড়িলেন সে ইতিহাসও আমার কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কেবল এক বৎসরের আলাপে তাঁহার চরিত্রের যে-পরিচয়টি আমি পাইয়াছিলাম এবং একদিন অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই পরিচয়ের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাই সংক্ষেপে বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিব। আমাদের দেশ ধর্ম্মোন্মত্ততার মল্লভূমি, ধর্ম্মের নামে মাথা কাটা-কাটি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষু অভিরামের হৃদয়ে এই ধর্ম্মানুরাগ যে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই এবং পরে যে আর দেখিব সে সম্ভাবনাও অল্প।

ভিক্ষু অভিরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইম্পীরিয়াল

লাইব্রেরীতে। বছর-চারেক আগেকার কথা, তখন আমি সবেমাত্র বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছি। একখানা দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুস্তক খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম তিনি পূর্ব্ব হইতে সেখানা দখল করিয়া বসিয়া আছেন।

ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। শীর্ণকায় মুণ্ডিতশির লোকটি, দেহের বস্ত্রাদি ঈষৎ পীতবর্ণ, বয়স বোধ করি চল্লিশের নীচেই। কথাবার্ত্তা খুব মিষ্ট, হাসিটি শীর্ণ মুখে লাগিয়াই আছে; আমাদের দেশের সাধারণ উদাসী সম্প্রদায়ের মত একটি নির্লিপ্ত অনাসক্ত ভাব। তবু তাঁহাকে সাধারণ বলিয়া অবহেলা করা যায় না। চোখের মধ্যে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, একটা প্রবল দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সদাসর্ব্বদা সেখানে জ্বলিতেছে। জটা কৌপীন কিছুই নাই, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পরশ-পাথরে'র সেই ক্ষ্যাপাকে মনে পড়িয়া যায়—

> ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
> রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে
> দুটা চক্ষু সদা যেন নিশার খদ্যোত হেন
> উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।

বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু বর্ত্তমান কালে থাকিতে পারে এ কল্পনা পূর্ব্বে মনে স্থান পায় নাই, তাই প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রমশ আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। তিনি সময়ে অসময়ে আমার বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান যেরূপ গভীর ছিল, বৌদ্ধ ইতিহাসে ততটা ছিল না। তাই বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কোন নূতন কথা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আমাকে আসিয়া জানাইতেন। আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধেও তাঁহার ঔৎসুক্যের

অন্ত ছিল না; ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হইয়া বসিয়া আমার বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেন, আর তাঁহার চোখে সেই খদ্যোত-আলোক জ্বলিতে থাকিত।

খাদ্যাদি বিষয়ে তাঁহার কোন বিচার ছিল না। আমার বাড়ীতে আসিলে গৃহিণী প্রায়ই ভক্তিভরে তাঁহাকে খাওয়াইতেন; তিনি নির্ব্বিবাদে মাছ মাংস সবই গ্রহণ করিতেন। আমি একদিন প্রশ্ন করায় তিনি ক্ষীণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্রে যে যা দেবে তাই আমাকে খেতে হবে, বাছবিচার করবার ত আমার অধিকার নেই। তথাগতের পাতে একদিন তাঁর এক শিষ্য শূকর-মাংস দিয়েছিল, তিনি তাও খেয়েছিলেন।' ভিক্ষুর দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

প্রায় ছয়-সাত মাস কাটিয়া যাইবার পর একদিন তাঁহার প্রাণের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিলাম। আমার বাড়ীতে বসিয়া বৌদ্ধ শিল্প আলোচনা হইতেছিল। ভিক্ষু অভিরাম বলিতেছিলেন, 'ভারতে এবং ভারতের বাইরে কোটি কোটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সবগুলিই তাঁর ভাব-মূর্ত্তি। ভক্ত-শিল্প যে ভাবে ভগবান তথাগতকে কল্পনা করেছে, পাথর কেটে তাঁর সেই মূর্ত্তিই গড়েছে। বুদ্ধের সত্যিকার আকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না।'

আমি বলিলাম, 'আমার ত মনে হয়, ছিল। আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে, সব বুদ্ধ-মূর্ত্তিরই ছাঁচ প্রায় এক রকম। অবশ্য অল্পবিস্তর তফাৎ আছে, কিন্তু মোটের উপর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়,—কান বড়, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী গড়ন—এগুলো সব মূর্ত্তিতেই আছে। এর কারণ কি? নিশ্চয় তাঁর প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে শিল্পীদের জ্ঞান ছিল, নইলে কেবল কাল্পনিক মূর্ত্তি হ'লে এতটা সাদৃশ্য আসতে পারত না। একটা বাস্তব মডেল তাদের ছিলই।'

গভীর মনঃসংযোগে আমার কথা শুনিয়া ভিক্ষু অভিরাম কিছুক্ষণ চুপ

করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কি জানি। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর মূর্ত্তি গঠিত হয় নি, তখন ভাস্কর্য্যের প্রচলন ছিল না। বুদ্ধ-মূর্ত্তির বহুল প্রচলন হয়েছে গুপ্ত-যুগ থেকে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বুদ্ধ-নির্ব্বাণের প্রায় সাত-শ বছর পরে। এ সাত-শ বছর ধরে তাঁর আকৃতির স্মৃতি মানুষ কি ক'রে সঞ্জীবিত রেখেছিল? বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও তাঁর চেহারার এমন কোন বর্ণনা নেই যা থেকে তাঁর একটা স্পষ্ট চিত্র আঁকা যেতে পারে। আপনি যে সাদৃশ্যের কথা বলছেন, সেটা সম্ভবত শিল্পের একটা কনভেনশ্যন—প্রথমে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী তাঁর ভাব-মূর্ত্তি গড়েছিলেন, তার পর যুগপরম্পরায় সেই মূর্ত্তিরই অনুকরণ হয়ে আসছে।' ভিক্ষু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, 'না—তাঁর সত্যিকার চেহারা মানুষ ভুলে গেছে।—টুটেনখামেন আমেন-হোটেপের শিলা-মূর্ত্তি আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের দিব্য দেহের প্রতিমূর্ত্তি নেই।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মানুষের স্মৃতির ওপর যাদের কোন দাবি নেই তারাই পাথরে নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি খোদাই করিয়ে রেখে গেছে, আর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কেবল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমর হয়ে আছেন। এই দেখুন না, যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত চেহারা যে কি রকম ছিল তা কেউ জানে না।'

তিনি বলিলেন, 'ঠিক। অথচ কত হাজার হাজার লোক তাঁর গায়ের একটা জামা দেখবার জন্য প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রা করছে। তারা যদি তাঁর প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তির সন্ধান পেত, কি করত বলুন দেখি। বোধ হয় আনন্দে পাগল হয়ে যেত।'

এই সময় তাঁহার চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। ইংরাজীতে যাহাকে ফ্যানাটিক বলে, এ সেই তাহারই দৃষ্টি। যে উগ্র একাগ্রতা মানুষকে শহীদ করিয়া তোলে, তাঁহার চোখে সেই সর্ব্বগ্রাসী তন্ময়তার

আগুন জ্বলিতেছে। চক্ষু-দুটা আমার পানে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাঁহার মন যেন আড়াই হাজার বৎসরের ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া এক দিব্য পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

তিনি হঠাৎ বলিতে লাগিলেন, 'ভগবান বুদ্ধের দন্ত কেশ নখ দেখেছি; কিছু দিনের জন্য এক অপরূপ আনন্দের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। কিন্তু তবু তাতে মন ভরল না। কেমন ছিল তাঁর পূর্ণাবয়ব দেহ? কেমন ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টি? তাঁর কণ্ঠের বাণী—যা শুনে একদিন রাজা সিংহাসন ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, গৃহস্থ-বধূ স্বামী-পুত্র ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়েছিল—সেই কণ্ঠের অমৃতময় বাণী যদি একবার শুনতে পেতুম—'

দুর্দ্দম আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞাতে দুই শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; এত অল্প কারণে এতখানি ভাবাবেশ কখনও সম্ভব মনে করি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে, কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র কোন কোন বৈষ্ণবের দশা উপস্থিত হয়, বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু ভিক্ষুর এই অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনা দেখিয়া আর তাহা অসম্ভব বোধ হইল না। ধর্ম্মের এ-দিকটা কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই; আজ যেন হঠাৎ চোখ খুলিয়া গেল।

ভিক্ষু বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'গৌতম! তথাগত! আমি অর্হত্ত্ব চাই না, নির্ব্বাণ চাই না,—একবার তোমার স্বরূপ আমাকে দেখাও। যে-দেহে তুমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে সেই দেব-দেহ আমাকে দেখাও। বুদ্ধ, তথাগত—'

বুঝিলাম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম নয়, স্বয়ং সেই কালজয়ী মহাপুরুষ ভিক্ষু অভিরামকে উন্মাদ করিয়াছেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এই আত্মহারা ব্যাকুলতা বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, মনে হইতে লাগিল যেন অপরাধ করিতেছি।

২

ধর্ম্মোন্মত্ততা বস্তুটা সংক্রামক। আমার মধ্যেও বোধ হয় অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই, উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া দৃষ্টি আটকাইয়া গেল ; আনন্দ ও উত্তেজনায় একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম। ফা-হিয়ান পূর্ব্বেও পড়িয়াছি, কিন্তু এ-জিনিষ চোখে ঠেকে নাই কেন ?

সেইদিন অপরাহ্ণে ভিক্ষু অভিরাম আসিলেন। উত্তেজনা দমন করিয়া বইখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উৎসুক ভাবে বলিলেন, 'এ কি ?'

'পড়ে দেখুন' বলিয়া একটা পাতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। ভিক্ষু পড়িতে লাগিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"বৈশালী হইতে দ্বাদশ শত পদ দক্ষিণে বৈশ্যাধিপতি সুদত্ত দক্ষিণাভিমুখী একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের বামে ও দক্ষিণে স্বচ্ছ বারিপূর্ণ পুষ্করিণী বহু বৃক্ষ ও নানাবর্ণ পুষ্পে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ইহাই জেতবন-বিহার।

"বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর হিতার্থে নব্বই দিবস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখন প্রসেনজিৎ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া গোশীর্ষ চন্দন-কাষ্ঠে তাঁহার এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যে-স্থানে তিনি সাধারণতঃ উপবেশন করিতেন তথায় স্থাপন করিলেন।

বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিলে এই মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিল। বুদ্ধদেব তখন মূর্ত্তিকে কহিলেন, 'তুমি স্বস্থানে প্রতিগমন কর; আমার নির্ব্বাণ লাভ হইলে তুমি আমার চতুর্ব্বর্গ শিষ্যের নিকটে আদর্শ হইবে।' এই বলিলে মূর্ত্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই মূর্ত্তিই বুদ্ধদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম মূর্ত্তি এবং ইহা দৃষ্টেই পরে অন্যান্য মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে।

"বুদ্ধ-নির্ব্বাণের পরে এক সময় আগুন লাগিয়া জেতবন-বিহার ভস্মীভূত হয়। নরপতিগণ ও তাঁহাদের প্রজাবর্গ চন্দন-মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হন; কিন্তু চারি-পাঁচ দিন পরে পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইলে চন্দন-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। সকলে উৎফুল্ল হৃদয়ে একত্র হইয়া বিহার পুনর্নির্ম্মাণে ব্রতী হইল। দ্বিতল নির্ম্মিত হইলে তাহারা প্রতিমূর্ত্তিকে পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিল।..."

তন্দ্রামূঢ়ের ন্যায় চক্ষু পুস্তক হইতে তুলিয়া ভিক্ষু আমার পানে চাহিলেন, অস্পষ্ট স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'কোথায় সে মূর্ত্তি?'

আমি বলিলাম, 'জানি না! চন্দন-মূর্ত্তির উল্লেখ আর কোথাও দেখেছি ব'লে ত স্মরণ হয় না।'

অতঃপর দীর্ঘকাল আবার দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এই ক্ষুদ্র তথ্যটি ভিক্ষুর অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নাড়া দিয়া আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। আমি বোধ হয় মনে মনে তাঁহার নিকট হইতে আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; এই ভাবে অভাবিতের সম্মুখীন হইয়া তিনি কি বলিবেন কি করিবেন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার কৌতূহলও ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না; প্রায় আধ ঘণ্টা নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। চক্ষে সেই সদ্যনিদ্রোত্থিতের অভিভূত দৃষ্টি—কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, নিশির ডাক শুনিয়া ঘুমন্ত মানুষ যেমন শয্যা ছাড়িয়া একান্ত অবশে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর তিন মাস আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

হঠাৎ পৌষের মাঝামাঝি একদিন তিনি মূর্ত্তিমান ভূমিকম্পের মত আসিয়া আমার স্থাবরতার পাকা ভিৎ এমনভাবে নাড়া দিয়া আল্গা করিয়া দিলেন যে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে অনুমান করাও কঠিন। অন্তত আমি যে কোন দিন এমন একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া পড়িব তাহা সন্দেহ করিতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

তিনি বলিলেন, 'সন্ধান পেয়েছি।'

আমি সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম, 'আসুন—বসুন।'

তিনি বসিলেন না, উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'পেয়েছি বিভূতি বাবু, সে মূর্ত্তি হারায় নি, এখনও আছে।'

'সে কি, কোথায় পেলেন?'

'পাই নি এখনও। প্রাচীন বৈশালীর ভগ্নাবশেষ যেখানে পড়ে আছে সেই 'বেসাড়ে' গিয়েছিলুম। জেতবন-বিহারের কিছুই নেই, কেবল ইট আর পাথরের স্তূপ। তবু তারই ভেতর থেকে আমি সন্ধান পেয়েছি—সে মূর্ত্তি আছে।'

'কি ক'রে সন্ধান পেলেন?'

'এক শিলালিপি থেকে। একটা ভাঙা মন্দিব থেকে একটা পাথর খ'সে পড়েছিল—তারই উল্টো পিঠে এই লিপি খোদাই করা ছিল।' এক খণ্ড কাগজ আমাকে দিয়া উত্তেজনা-অবরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'জেতবন-বিহার ধ্বংস হয়ে যাবার পর বোধ হয় তারই পাথর দিয়ে ঐ

মন্দির তৈরি হয়েছিল; মন্দিরটাও পাঁচ-ছ-শ বছরের পুরনো, এখন তাতে কোন বিগ্রহ নেই।—একটা বিরাট অশথ্‌ গাছ তাকে অজগরের মত জড়িয়ে তার হাড়-পাঁজর গুঁড়ো ক'রে দিচ্ছে—পাথরগুলো খ'সে খ'সে পড়ছে। তারই একটা পাথরে এই লিপি খোদাই করা ছিল।'

কাগজখানি তাঁর হাত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; অনুমান দশম কি একাদশ শতাব্দীর প্রাকৃত ভাষায় লিখিত লিপি, ভিক্ষু অবিকল নকল করিয়া আনিয়াছেন।

পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। শিলালেখের অর্থ এইরূপ—

"হায় তথাগত! সদ্ধর্ম্মের আজ মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। যে জেতবন-বিহারে তুমি পঞ্চবিংশ বর্ষ যাপন করিয়াছ তাহার আজ কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! গৃহিগণ আর তোমার শ্রমণদিগকে ভিক্ষা দান করে না; রাজগণ বিহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। পৃথিবীর প্রান্ত হইতে শিক্ষার্থিগণ আর বিনয়-ধর্ম্ম-সূত্ত অধ্যয়নের জন্য বিহারে অগমন করে না। তথাগতের ধর্ম্মের গৌরব-মহিমা অস্তমিত হইয়াছে।

"তদুপরি সম্প্রতি দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ চারিদিক হইতে জনশ্রুতি আসিতেছে যে, তুরুষ্ক নামক এক অতি বর্ব্বর জাতি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহারা বিধর্ম্মী ও অতিশয় নিষ্ঠুর; ভিক্ষু-শ্রমণ দেখিলেই নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে এবং বিহার-সঙ্ঘাদি লুণ্ঠন করিতেছে।

"এই সকল জনরব শুনিয়া ও তুরুষ্কগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত কয়েক জন মুমূর্ষু পলাতক শ্রমণকে দেখিয়া জেতবন-বিহারের মহাথের বুদ্ধরক্ষিত মহাশয় অতিশয় বিচলিত হইয়াছেন। তুরুষ্কগণ এই দিকেই আসিতেছে

অবশ্যই বিহার আক্রমণ করিবে। বিহারের অধিবাসিগণ অহিংসধর্ম্মী, অস্ত্রচালনায় অপারগ। বিহারে বহু অমূল্য রত্নাদি সঞ্চিত আছে; সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য রত্ন আছে, গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি—যাহা ভগবান তথাগতের জীবিতকালে প্রসেনজিৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তুরুষ্কের আক্রমণ হইতে এ সকলকে রক্ষা করিবে?

"মহাথের বুদ্ধরক্ষিত তিন দিবস অহোরাত্র চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিয়াছেন। আগামী অমাবস্যার মধ্যযামে দশ জন শ্রমণ বিহারস্থ মণি-রত্ন ও অমূল্য গ্রন্থ সকল সহ ভগবানের চন্দন-মূর্ত্তি লইয়া প্রস্থান করিবে। বিহার হইতে বিংশ যোজন উত্তরে হিমালয়ের সানু-নিম্নাত উপলা নদীর প্রস্রবণ মুখে এক দৈত্যনির্ম্মিত পাষাণ-স্তম্ভ আছে; এই গগনলেহী স্তম্ভের শীর্ষদেশে এক গোপন ভাণ্ডার আছে। কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্ম্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শ্রমণগণ চন্দন-মূর্ত্তি ও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু এই গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবে। পরে তুরুষ্কের উৎপাত দূর হইলে তাহারা আবার উহা ফিরাইয়া আনিবে।

"যদি তুরুষ্কের আক্রমণে বিহার ধ্বংস হয়, বিহারবাসী সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় মহাথের মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে পরবর্ত্তীদিগের অবগতির জন্য অদ্য কৃষ্ণাত্রয়োদশীর দিবসে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল। ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এইখানে লিপি শেষ হইয়াছে। লিপি পড়িতে পড়িতে আমার মনটাও অতীতের আবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছিল; আট শত বৎসর পূর্ব্বে জেতবন-বিহারের নিরীহ ভিক্ষুদের বিপদ-ছায়াচ্ছন্ন ত্রস্ত চঞ্চলতা যেন অস্পষ্ট ভাবে

চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলাম ; বিচক্ষণ প্রবীণ মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখচ্ছবিও চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ যেন ঐ লিপির সাহায্যে আমি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চলচ্ছায়ার মত প্রত্যক্ষ করিয়া লইলাম। দেশব্যাপী সন্ত্রাস! শান্তিপ্রিয় নির্বীর্য্য জাতির উপর সহসা দুরন্ত দুর্ম্মদ বিদেশীর অভিযান! 'তুরুষ্ক! তুরুষ্ক! ঐ তুরুষ্ক আসিতেছে!' ভীত কণ্ঠের সহস্র সমবেত আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে বাজিতে লাগিল।

তার পর চমক ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম ভিক্ষু অভিরামের চোখে ক্ষুধিত উল্লাস। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—কিন্তু কত বিলম্বে!'

তিনি প্রদীপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হোক বিলম্ব। তবু এখনও সময় অতীত হয় নি। আমি যাব বিভূতিবাবু। সেই অসুরনির্ম্মিত পাষাণস্তম্ভ খুঁজে বার করব। কিছু সন্ধানও পেয়েছি—উপলা নদীর বর্ত্তমান নাম জানতে পেরেছি।—বিভূতিবাবু, দেড় হাজার বছর আগে চৈনিক পরিব্রাজক কোরিয়া থেকে যাত্রা সুরু ক'রে গোবি মরুভূমি পার হয়ে দুস্তর হিমালয় লঙ্ঘন ক'রে পদব্রজে ভারতভূমিতে আসতেন। কি জন্যে? কেবল বুদ্ধ তথাগতের জন্মভূমি দেখবার জন্যে! আর, আমাদের বিশ যোজনের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের স্বরূপ-মূর্ত্তি রয়েছে, জানতে পেরেও আমরা তা খুঁজে বার করতে পারব না?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় পারবেন।'

ভিক্ষু তাঁহার বিদ্যুদ্বহ্নিপূর্ণ চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া এক প্রচণ্ড প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'বিভূতিবাবু, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?'

ক্ষণকালের জন্য হতবাক্ হইয়া গেলাম। আমি যাইব! কাজকর্ম্ম ফেলিয়া পাহাড়ে-জঙ্গলে এই মায়ামৃগের অন্বেষণে আমি কোথায় যাইব!

ভিক্ষু স্পন্দিতস্বরে বলিলেন, 'আট-শ বছরের মধ্যে সে দিব্যমূর্ত্তি কেউ দেখেনি। ভগবান শাক্যসিংহ আট শতাব্দী ধ'রে সেই স্তম্ভশীর্ষে আমাদেরই প্রতীক্ষা করেছেন—আপনি যাবেন না?'

ভিক্ষুর কথার মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু মজ্জাগত বহির্বিমুখতা ও বাঙালীসুলভ ঘরের টান যেন সঙ্গীতযন্ত্রের উচ্চ সপ্তকের তারের মত সুরের অসহ্য স্পন্দনে ছিঁড়িয়া গেল। আমি উঠিয়া ভিক্ষুকের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'আমি যাব।'

৩

এই আখ্যায়িকা যদি আমাদের হিমাচল-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী হইত তাহা হইলে বোধ করি নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু এ-গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অবান্তর কথার স্থান নাই। দৈত্য-নির্ম্মিত স্তম্ভ অন্বেষণের পরিসমাপ্তিটুকু বর্ণনা করিয়াই আমাকে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

কলিকাতা হইতে যাত্রা সুরু করিবার দুই সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্ণে যে ক্ষুদ্র জনপদটিতে পৌঁছিলাম তাহা মনুষ্য-লোকালয় হইতে এত ঊর্দ্ধে ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত যে হিমালয়-কুক্ষিস্থিত ঈগল পাখীর বাসা বলিয়া ভ্রম হয়। তখনও বরফের এলাকায় আসিয়া পৌঁছাই নাই; কিন্তু সম্মুখেই হিমাদ্রির তুষারশুভ্র দেহ আকাশের একটা দিক্ আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আশেপাশে পিছনে চারি দিকেই নগ্ন পাহাড়, পায়ের তলায় পাহাড়ী কাঁকর ও উপলখণ্ড। এই উপলাকীর্ণ কঠিন ভূমি চিরিয়া তন্বী উপলা নদী ক্ষুরধারে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিতেছে। আকাশে বাতাসে একটা জমাট শীতলতা।

আমরা তিন জন—আমি, ভিক্ষু অভিরাম ও একজন ভুটিয়া পথপ্রদর্শক—গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতেই গ্রামের সমস্ত স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বহির্জ্জগতের মানুষ এখানে কখনও আসে না; ইহারা সুবর্ত্তুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

চেহারা দেখিয়া মনে হইল ইহারা লেপ্‌চা কিংবা ভুটানী। আর্য্য রক্তের সংমিশ্রণও সামান্য আছে; দুই-একটা খড়্গের মত তীক্ষ্ণ নাক চোখে পড়িল।

এইরূপ খড়্গ-নাসিক একজন প্রৌঢ়গোছের লোক আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ ভাষায় কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের ভুটানী সহচর বুঝাইয়া দিল, ইনি গ্রামের মোড়ল, আমরা কি জন্য আসিয়াছি জানিতে চাহেন।

আমরা সরলভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া লোকটির চোখে মুখে প্রথমে বিস্ময়, তার পর প্রবল কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া গ্রামে লইয়া চলিল।

মিছিল করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। অগ্রে মোড়ল, তাহার পিছনে আমরা তিন জন ও সর্ব্বশেষে গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারী।

একটি কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া মোড়ল আমাদের বসাইল, আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুৎপীড়িত দেখিয়া আহার্য্য দ্রব্য আনিয়া অতিথিসৎকার করিল। অতঃপর তৃপ্ত ও বিশ্রান্ত হইয়া দোভাষী ভুটিয়া মারফৎ বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম। সূর্য্য তখন পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; হিমালয়ের সুদীর্ঘ সন্ধ্যা যেন স্বচ্ছ বাতাসে অলক্ষিত কুঙ্কুমবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে।

মোড়ল বলিল, গ্রাম হইতে চার ক্রোশ উত্তরে উপলা নদীর প্রপাত—ঐ প্রপাত হইতেই নদী আরম্ভ। ঐ স্থান অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ; উপলার অপর পারে প্রপাতের ঠিক মুখের উপর একটি স্তম্ভের মত পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে, উহাই বুদ্ধস্তম্ভ নামে খ্যাত। গ্রামবাসীরা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে বুদ্ধ-স্তম্ভকে উদ্দেশ করিয়া পূজা দিয়া থাকে। কিন্তু সে স্থান দুরধিগম্য বলিয়া সেখানে কেহ যায় না, গ্রামের নিকটে উপলা নদীর স্রোতে পূজা ভাসাইয়া দেয়।

ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন, উপলা পার হইয়া স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী হইবার পথ কোথায়? মোড়ল মাথা নাড়িয়া জানাইল, পথ আছে বটে, কিন্তু

তাহা এত বিপজ্জনক যে সে-পথে কেহ পার হইতে সাহস করে না। উপলার প্রপাতের নীচেই একটি প্রাচীন লৌহ শৃঙ্খলের ঝোলা বা দোদুল্যমান সেতু দুই তীরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহা কালক্রমে এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার উপর দিয়া মানুষ যাইতে পারে না। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

আমাদের গন্তব্যস্থানে যে পৌঁছিয়াছি তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তবু নিঃসংশয় হইবার অভিপ্রায়ে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই স্তূপে কি আছে তাহা কেহ বলিতে পারে কি না। মোড়ল বলিল, কি আছে তাহা কেহ চোখে দেখে নাই, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বুদ্ধদেব স্বয়ং সশরীরে এই স্তূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দেহ হইতে নিরন্তর চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়;—পাঁচ হাজার বৎসর পরে আবার মৈত্রেয়-রূপ ধারণ করিয়া তিনি এই স্থান হইতে বাহির হইবেন।

ভিক্ষু আমার পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বুদ্ধদেব সশরীরে এই স্তূপে আছেন, তাঁর দেহ থেকে চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়—প্রবাদের মানে বুঝতে পারছেন? যে-শ্রমণরা বুদ্ধমূর্ত্তি এনেছিল, তারা সম্ভবত ফিরে যেতে পারে নি—এই গ্রামেই হয় ত থেকে গিয়েছিল—'.

ভিক্ষুর কথা শেষ হইতে পাইল না। এই সময় আমাদের কুটীর হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া মড়্-মড়্ করিয়া উঠিল। আমরা মেঝের উপর বসিয়া ছিলাম, আমাদের নিম্নে মাটির ভিতর দিয়াও একটা কম্পন শিহরিয়া উঠিল। আমিও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—'ভূমিকম্প!'

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ভূমিকম্পের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছিল। মোড়ল নিশ্চিন্তমনে মেঝেয় বসিয়া ছিল, আমাদের ত্রাস

দেখিয়া সে মৃদুহাস্তে জানাইল যে ভয়ের কোন কারণ নাই; এরূপ ভূমিকম্প এখানে প্রত্যহ চার-পাঁচ বার হইয়া থাকে, এ দেশের নামই ভূমিকম্পের জন্মভূমি।

আমরা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভূমিকম্পের জন্মভূমি! এমন কথা ত কখনও শুনি নাই।—তখনও জানিতাম না কি ভীষণ দুর্দ্দান্ত সন্তান প্রসব করিবার জন্ম সে উদ্যত হইয়া আছে।

ভিক্ষু অভিরাম কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক! ঠিক! শিলালিপিতে যে এ কথার উল্লেখ আছে—মনে নেই?'

শিলালিপিতে ভূমিকম্পের উল্লেখ কোথায় আছে স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভিক্ষু তখন ঝোলা হইতে শিলালেখের অনুলিপি বাহির করিয়া উল্লসিত স্বরে কহিলেন, 'আর সন্দেহ নেই বিভূতিবাবু, আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি।—এই শুনুন।' বলিয়া তিনি মূল প্রাকৃতে লিপির সেই অংশ পড়িয়া শুনাইলেন—কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্ম্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

মনে পড়িয়া গেল। 'স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশ' কথাটাকে আমি নিরর্থক বাগাড়ম্বর মনে করিয়াছিলাম, উহার মধ্যে যে ভূমিকম্পের ইঙ্গিত নিহিত আছে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন, ও-কথাগুলো আমি ভাল ক'রে লক্ষ্য করি নি। এ জায়গাটাও বোধ হয় শিলঙের মত ভূমিকম্পের রাজ্য—'

এই সময় মোড়লের দিকে নজর পড়িল। সে হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র তির্য্যক চক্ষু জলজল করিয়া জলিতেছে, ঠোঁট দুটা যেন কি একটা বলিবার জন্ম বিভক্ত হইয়া আছে। তারপর সে আমাদের

ধাঁধা লাগাইয়া পরিষ্কার প্রাকৃত ভাষায় বলিয়া উঠিল, 'শ্রবণ কর। সূর্য্য যে-সময় উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করিবেন সেই সময় বুদ্ধস্তম্ভের রন্ধ্রপথে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া তথাগতের দিব্যদেহ আলোকিত করিবে, মন্ত্রবলে স্তম্ভের দ্বার খুলিয়া যাইবে। উপর্য্যুপরি তিন দিন এইরূপ হইবে, তার পর এক বৎসরের জন্য দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। হে ভক্ত শ্রমণ, যদি বুদ্ধের অলৌকিক মুখচ্ছবি দেখিয়া নির্ব্বাণের পথ সুগম করিতে চাও, এ কথা স্মরণ রাখিও।' এক নিশ্বাসে এতখানি বলিয়া মোড়ল হাঁপাইতে লাগিল।

তীব্র বিস্ময়ে ভিক্ষু বলিলেন, 'তুমি—তুমি প্রাকৃত ভাষা জান ?'

মোড়ল বুঝিতে না পারিয়া মাথা নাড়িল।

তখন ভুটানী সহচরের সাহায্য লইতে হইল। দোভাষী-প্রমুখাৎ মোড়ল জানাইল, ইহা তাহাদের কৌলিক মন্ত্র ; পুরুষপরম্পরায় ইহা তাহাদের কণ্ঠস্থ করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ কি তাহা সে জানে না। আজ ভিক্ষুকে ঐ ভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া সে উত্তেজিত হইয়া উহা উচ্চারণ করিয়াছে।

আমরা পরস্পরের মুখের পানে তাকাইলাম।

ভিক্ষু মোড়লকে বলিলেন, 'তোমার মন্ত্র আর একবার বল।'

মোড়ল দ্বিতীয় বার ধীরে ধীরে মন্ত্র আবৃত্তি করিল। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। এ মন্ত্র নয়—বুদ্ধ-স্তম্ভে প্রবেশ করিবার নির্দ্দেশ। বৎসরের মধ্যে তিন দিন সূর্য্যালোকের উত্তাপ রন্ধ্রপথে স্তম্ভের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্ভবত কোন যন্ত্রকে উত্তপ্ত করে, ফলে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত দ্বার খুলিয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও আসীরিয়ায় এইরূপ কলকব্জার সাহায্যে মন্দিরদ্বার খুলিয়া মন্দিরের ভণ্ড পূজারিগণ অনেক বুজ্‌রুকি দেখাইত—পুস্তকে পড়িয়াছি স্মরণ হইল। এই স্তম্ভের নির্ম্মাতাও অসুর—অর্থাৎ

আসীরীয় শিল্পী ; সুতরাং অনুরূপ কলকব্জার দ্বারা উহার প্রবেশদ্বারের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব নয়। যে-শ্রমণগণ বুদ্ধ-মূর্ত্তি লইয়া এখানে আসিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এ রহস্য জানিত ; পাছে ভবিষ্য বংশ ইহা ভুলিয়া যায় তাই এই মন্ত্র রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মোড়ল এ মন্ত্র জানিল কিরূপে ?

তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। মুখের আদল প্রধানত মঙ্গোলীয় ছাঁচের হইলেও নাসিকা, ভ্রূ ও চিবুকের গঠন আর্য্য-লক্ষণযুক্ত। শ্রমণগণ ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই ; তাহাদের দশ জনের মধ্যে কাহারও হয়ত পদস্খলন হইয়াছিল। এই মোড়ল সেই ধর্ম্মচ্যুত শ্রমণের অধস্তন পুরুষ—পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সব ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল শূন্যগর্ভ কবচের মত কৌলিক মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

চমক ভাঙিয়া স্মরণ হইল বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনটি দিন স্তুপের দ্বার খোলা থাকে, তার পর বন্ধ হইয়া যায়। সে তিন দিন কবে ? কতদিন দ্বার খোলার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে ?

ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে সূর্য্য কবে পদার্পণ করবেন ?'

ভিক্ষু ঝোলা হইতে পাঁজি বাহির করিলেন। প্রায় পনর মিনিট গভীর তন্ময়তার সহিত পাঁজি দেখিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলাম তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তিনি বলিলেন, 'কাল পয়লা মাঘ ; সূর্য্য উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করবেন।—কি অলৌকিক সংঘটন ! যদি তিন দিন পরে এসে পৌছতুম—' তাহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া গেল, অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত !'

কি সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতার উপান্তে আসিয়া প্রতীক্ষা

করিতেছে, ভাবিয়া আমার দেহও কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, 'তথাগত, তোমার ভিক্ষুর মনস্কাম যেন ব্যর্থ না হয়।'

৪

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা স্তূপ-অভিমুখে যাত্রা করিলাম, মোড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল।

গ্রামের সীমানা পার হইয়াই পাহাড় ধাপে ধাপে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানে স্থানে চড়াই এত দুরূহ যে হস্তপদের সাহায্যে অতি কষ্টে আরোহণ করিতে হয়। পদে পদে পা ফস্কাইয়া নিম্নে গড়াইয়া পড়িবার ভয়।

ভিক্ষুর মুখে কথা নাই ; তাঁহার ক্ষীণ শরীরে শক্তিরও যেন সীমা নাই। সর্ব্বাগ্রে তিনি চলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পশ্চাতে কোনক্রমে উঠিতেছি। তিনি যেন তাঁহার অদম্য উৎসাহের রজ্জু দিয়া আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

তবু পথে দু-বার বিশ্রাম করিতে হইল। আমার সঙ্গে একটা বাইনকুলার ছিল, তাহারই সাহায্যে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে ক্ষুদ্র গ্রামটি খেলাঘরের মত দেখা যাইতেছে, আর চারিদিকে প্রাণহীন নিঃসঙ্গ পাহাড়।

অবশেষে পাঁচ ঘণ্টারও অধিক কাল হাড়ভাঙা চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম! কিছুপূর্ব্ব হইতেই একটা চাপা গম্ গম্ শব্দ কানে আসিতেছিল—যেন বহুদূরে দুন্দুভি বাজিতেছে। মোড়ল বলিল, 'উহা উপলা নদীর প্রপাতের শব্দ।'

প্রপাতের কিনারায় গিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন সম্মুখের অপরূপ দৃশ্য

যেন ক্ষণকালের জন্য আমাদের নিস্পন্দ করিয়া দিল। আমরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার প্রায় পঞ্চাশ হাত উর্দ্ধে সংকীর্ণ প্রণালী-পথে উপলার ফেনকেশর জলরাশি উগ্র আবেগভরে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে ; তার পর রামধনুর মত বঙ্কিম রেখায় দুই শত হাত নীচে পতিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনায় তীব্র একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া রহিয়া গিয়াছে। ফুটন্ত কটাহ হইতে যেমন বাষ্প উত্থিত হয়, তেমনই তাহার শিলাহত চূর্ণ শীকরকণা উঠিয়া আসিয়া আমাদের মুখে লাগিতেছে।

এখানে দুই তীরের মধ্যস্থিত খাদ প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া—মনে হয় যেন পাহাড় এই স্থানে বিদীর্ণ হইয়া অবরুদ্ধ উপলার বহির্গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ খাদ পার হইবার জন্য বহুযুগ পূর্ব্বে দুর্ব্বল মানুষ যে ক্ষীণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা দেখিলে ভয় হয়। দুইটি লোহার শিকল—একটি উপরে, অন্যটি নীচে—সমান্তরাল ভাবে এ-তীর হইতে ও-তীরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সেতু। গর্জ্জমান প্রপাতের পট-ভূমিকার সম্মুখে এই শীর্ণ মরিচা-ধরা শিকল দুটি দেখিয়া মনে হয় যেন মাকড়সার তন্তুর চেয়েও ইহারা ভঙ্গুর, একটু জোরে বাতাস লাগিলেই ছিঁড়িয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ওপারের কথা এখনও বলি নাই। ওপারের দৃশ্যের প্রকৃতি এপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই ধাতুগত বিভিন্নতার জন্যই বোধ করি প্রকৃতিদেবী ইহাদের পৃথক করিয়া দিয়াছেন। ওপারে দৃষ্টি পড়িলে সহসা মনে হয় যেন অসংখ্য মর্ম্মরনির্ম্মিত গম্বুজে স্থানটি পরিপূর্ণ। ছোট-বড়-মাঝারি বর্ত্তুলাকৃতি শ্বেতপাথরের ঢিবি যত দূর দৃষ্টি যায় ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। যাঁহারা সারনাথের ধামেক স্তূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। এই প্রকৃতি-নির্ম্মিত স্তূপগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া গভীর খাদের ঠিক কিনারায় একটি নিটোল সুন্দর স্তম্ভ

মিনারের মত ঋজুরেখায় উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকিরণে তাহার পাষাণ গাত্র ঝকমক করিতেছে। দেখিয়া সন্দেহ হয়, ময়দানবের মত কোন মায়া-শিল্পীই বুঝি অতি যত্নে এই অভ্রভেদী দেব-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর শৈশবকালে প্রকৃতি যথন আপন মনে খেলাঘর তৈয়ার করিত, ইহা সেই সময়ের সৃষ্টি। হয়ত মানুষ-শিল্পীর হাতও ইহাতে কিছু আছে। বাইনকুলার চোখে দিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইহার বহিরঙ্গে মানুষের হাতের চিহ্ন কিছু চোখে পড়িল না। স্তম্ভটা যে ফাঁপা তাহাও বাহির হইতে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই; কেবল স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র চোখে পড়িল—রন্ধ্রটি চতুষ্কোণ, বোধ করি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক হাতের বেশী হইবে না। সূর্য্যকিরণ সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ইহাই নিশ্চয় মন্ত্রোক্ত রন্ধ্র।

মগ্ন হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। এতক্ষণে পাশে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, ভিক্ষু ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বুদ্ধস্তম্ভকে প্রণাম করিতেছেন।

* * * *

ভিক্ষু অভিরাম আমাদের নিষেধ শুনিলেন না, একাকী সেই শিকলের সেতু ধরিয়া ওপারে গেলেন। আমরা তিন জন এপারে রহিলাম। পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, এবার বুঝি শিকল ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু ভিক্ষুর শরীর কৃশ ও লঘু, শিকল ছিঁড়িল না।

ওপারে পৌঁছিয়া ভিক্ষু হাত নাড়িয়া আমাদের আশ্বাস জানাইলেন, তার পর স্তম্ভের দিকে চলিলেন। স্তম্ভ একবার পরিক্রমণ করিয়া আবার হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া কি বলিলেন, প্রপাতের গর্জ্জনে শুনিতে পাইলাম না। মনে হইল তিনি স্তম্ভের দ্বার খোলা পাইয়াছেন।

তার পর তিনি স্তম্ভের অন্তরালে চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। চোখে বাইনকুলার লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম। মানস চক্ষে দেখিতে লাগিলাম, ভিক্ষু চক্রাকৃতি অন্ধকার সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছেন; কম্পিত অধর হইতে হয়ত অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হইতেছে—তথাগত, তমসো মা জ্যোতির্গময়—

সেই গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠের মূর্তি কি এখনও আছে? ভিক্ষু তাহা দেখিতে পাইবেন? আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সেজন্য ক্ষোভ নাই। যদি সে-মূর্তি থাকে, পরে লোকজন আনিয়া উহা উদ্ধার করিতে পারিব। দেশময় একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তায় দশ মিনিট কাটিল।

তারপর সব ওলট-পালট হইয়া গেল। হিমালয় যেন সহসা পাগল হইয়া গেল। মাটি টলিতে লাগিল; ভূগর্ভ হইতে একটা অবরুদ্ধ গোঙানি যেন মরণাহত দৈত্যের আর্তনাদের মত বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। শিকলের সেতু ছিঁড়িয়া গিয়া চাবুকের মত দুই তীরে আছড়াইয়া পড়িল।

১লা মাঘের ভূমিকম্পের বর্ণনা আর দিব না। কেবল এইটুকুই জানাইব যে ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে যাঁহারা এই ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ভূমিকম্পের জন্মকেন্দ্রের অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবেন না।

আমরা মরি নাই কেন জানি না। বোধ করি পরমায়ু ছিল বলিয়াই মরি নাই। নৃত্যোন্মাদ মাটি—তাহারই উপর উপুড় হইয়া নড়িয়া ছিলাম। চোখের সম্মুখে বুদ্ধ-স্তম্ভ বাত্যাবিপন্ন জাহাজের মাস্তুলের মত দুলিতেছিল। চিন্তাহীন জড়বৎ মন লইয়া সেই দিকে তাকাইয়া ছিলাম।

মনের উপর সহসা চিন্তার ছায়া পড়িল—

ভিক্ষু! ভিক্ষুর কি হইবে?

ভূমিকম্পের বেগ একটু মন্দীভূত হইল। বোধ হইল যেন থামিয়া আসিতেছে। বাইনকুলারটা হাতেই মুষ্টিবদ্ধ ছিল, তুলিয়া চোখে দিলাম। পলায়নের চেষ্টা বৃথা, তাই সে-চেষ্টা করিলাম না।

আবার দ্বিগুণ বেগে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল; যেন ক্ষণিক শিথিলতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া শতগুণ হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, এবার পৃথিবী ধ্বংস না করিয়া ছাড়িবে না।

কিন্তু ভিক্ষু—?

স্তম্ভ এতক্ষণ মাস্তুলের মত দুলিতেছিল, আর সহ্য করিতে পারিল না; মূলের নিকট হইতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অতল খাদের প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য টলমল করিল, তার পর মরণোন্মত্তের মত খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিল। গভীর নিম্নে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠিয়া স্তম্ভকে আমার চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া দিল।

স্তম্ভ যখন খাদের কিনারায় দ্বিধাভরে টল্‌মল্ করিতেছিল, সেই সময় চকিতের ন্যায় ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলাম। বাইনকুলারটা অবশে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম, ভিক্ষু রন্ধ্রপথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মুখে রৌদ্র পড়িয়াছে। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সে মুখ উদ্ভাসিত। চারিদিকে যে প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার চলিয়াছে সেদিকে তাঁহার চেতনা নাই।

আর তাঁহাকে দেখিলাম না; মরণোন্মত্ত স্তম্ভ খাদে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*

একাকী গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।

তার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ কাহিনী কাহাকেও বলিতে পারি নাই। ভিক্ষুর কথা স্মরণ হইলেই মনটা অপরিসীম বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠে।

তবু এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাই যে, তাঁহার জীবনের চরম অভীপ্সা অপূর্ণ নাই। এই স্তম্ভশীর্ষে তিনি তথাগতের কিরূপ নয়নাভিরাম মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যুমুহূর্ত্তে তাঁহার মুখের উদ্ভাসিত আনন্দ আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

সেতু

হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল ··পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, 'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র রাত্রি . টা ১৭ মিনিটে জন্ম'···

রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু, লালসাময়ী রল্লা—

এ কি স্বপ্ন? না আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্ব্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত! পূর্ব্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? মৃত্যু হয় জানি, কিন্তু সেইখানেই ত সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে সুরু ধরিয়া নূতন কোনও জীবন আরম্ভ হয় নাকি?

আমার স্বপ্নটা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল। একটা মানুষের জীবন—সে মানুষটা কি আমি?—উল্টা দিক দিয়া দেখিতে পাইলাম; এক মৃত্যু হইতে অন্য জন্ম পর্য্যন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ—ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণ-ভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা 'অব্যক্ত'। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিস্মরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন সেই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।

সত্যই কি সেতু আছে? আমি বৈজ্ঞানিক, কল্পনার ধার ধারি না। আলোকরশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না, এই বিষয় লইয়া গত তিন বৎসর গবেষণা করিতেছি। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কাল আমার কাজ শেষ হইয়াছে। হাল্কা মন ও হাল্কা মস্তিষ্ক লইয়া শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। তার পর ঐ স্বপ্ন! ভাবিতেছি, এ-স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনাই হয়, তবে সে এই সকল অদ্ভুত উপাদান সংগ্রহ করিল কোথা হইতে? আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে ত এ-সকল অভিজ্ঞতা ছিল না! কল্পনা কি কেবল শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হয়? রক্তের মধ্যে সামান্য একটু কার্ব্বন-ডায়অক্সাইডের আধিক্য কি নিরবয়ব 'নাস্তি'কে মূর্ত্ত বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে?

জানি না। আমার যুক্তি-বিধিবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বপ্নের আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

যে-শিশু কাঁদিয়া উঠিল, সে কে? আমি? আর সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর!—পুরাতন ডায়েরী খুলিয়া দেখিতেছি, ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে আমার জন্ম হইয়াছিল।

*   *   *   *

দেখিতেছি, আমার সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল অঙ্গার-পিণ্ড জ্বলিতেছে। বৃহৎ অঙ্গার-চুল্লী, ভস্ত্রার ফুৎকারে উগ্র নির্ধূম প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আবার ভস্ত্রার বিরামকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিতেছে। এই অগ্নির মধ্যস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে আমার অসি-ফলক।

কক্ষ ঈষদন্ধকার; চারিদিকে নানা আকৃতির লৌহ-ফলক নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোনটি খড়্গের আকার ধারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া গিয়াছে; কোনটি দণ্ডের আকারে শূল অথবা মুদ্গরে পরিণত হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীরগাত্রে সুসম্পূর্ণ ভল্ল অসি লৌহজালিক সজ্জিত রহিয়াছে। অঙ্গার-পিণ্ডের আলোকে ইহারা ঝলসিয়া উঠিতেছে, পুনরায় ম্লান অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বপ্নলোকে জাগিয়া উঠিলাম। জলন্ত চুল্লীর অদূরে বেত্রাসনে বসিয়া আমি করলগ্ন কপোলে দেখিতেছি, আর অসি-ধাবক তণ্ডু অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ভস্ত্রা চালাইতেছে।

এ দৃশ্য আমার কাছে একান্ত পরিচিত, তাই বিস্মিত হইতেছি না। চেতনার মধ্যে ইহার সমস্ত পূর্ব্ব-সংযোগ নিষ্ক্রিয় ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ছায়ান্ধকার কক্ষটি উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ শস্ত্র-শিল্পী তণ্ডুর যন্ত্রাগার। আমি দক্ষিণ মণ্ডলে উপনিবিষ্ট শকবাহিনীর একজন পত্তিনায়ক—আমার নাম অহিদত্ত রঞ্জুল। আমি তণ্ডুর যন্ত্রাগারে বসিয়া আছি কেন? অসি সংস্কার করিবার জন্য? তণ্ডুর মত এত বড় অসি-শিল্পী শুনিয়াছি শক-মণ্ডলে আর নাই, সে অসিতে এমন ধার দিতে পারে যে, নিপুণ শস্ত্রী তাহার দ্বারা আকাশে ভাসমান কাশ-পুষ্পকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে! কিন্তু এই জন্যই কি গত বসন্তোৎসবের পর হইতে বার-বার তাহার গৃহে আসিতেছি?

চুল্লীর আলোকে তণ্ডুর মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ রক্তহীন মুখ; গুম্ফ ও ভ্রূর রোম চুল্লীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া হনু-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থিসার বক্র নাসিকা এই জরাবিধ্বস্ত মুখের চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস করিতেছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুটা অস্বাভাবিক রকম জীবিত, ভগ্নমেরু মুমূর্ষু সর্পের চক্ষুর মত যেন একটা বিষাক্ত জিঘাংসা বিকীর্ণ করিতেছে।

তণ্ডু যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিতেছে। আমার অসি-ফলক অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া রসায়ন-মিশ্র জলে ডুবাইতেছে, সন্তর্পণে ফলকের ধার পরীক্ষা করিতেছে, আবার তাহা অঙ্গারমধ্যে প্রোথিত করিতেছে।

তাহার মুখে কথা নাই, কখনও সে সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া লইতেছে, তাহার পীত-দন্ত মুখ ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, অধরোষ্ঠ একটু নড়িতেছে—যেন সে নিজ মনে কথা কহিল—তার পর আবার কর্ম্মে মন দিতেছে।

আমিও তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন তাহাকে দেখিতেছে না। মন দেখিতেছে—কাহাকে?—রল্লা। লালসা-ময়ী কুহকিনী রল্লা! আমার ঐ উত্তপ্ত অসি-ফলকের ন্যায় কামনার শিখারূপিণী রল্লা!

একটা তীক্ষ্ণ বেদনা সূচীর মত হৃদয়যন্ত্রকে বিদ্ধ করিল। তণ্ডুর দেহ ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিলাম। এই জরাগলিত দেহ বৃদ্ধ রল্লার ভর্ত্তা। রল্লা আর তণ্ডু। বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষা-ফেনিল হাসি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ইহাদের দাম্পত্য জীবন কিরূপ? নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। বক্ষে বাহুতে উদ্ধত পেশী আস্ফালন করিতেছে—পঁচিশ বৎসরের দর্পিত যৌবন। তপ্ত শক-রক্ত যেন শুভ্র চর্ম্ম ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে।—আমি লোলুপ চোরের মত নানা ছলে তণ্ডুর গৃহে যাতায়াত করিতেছি, আর তণ্ডু—রল্লার স্বামী!

রল্লা কি কুহক জানে? নারী ত অনেক দেখিয়াছি, তীব্রনয়না গর্ব্বিতা শক-দুহিতা, মদালসনেত্রা স্ফুরিতাধরা অবন্তিকা, বিলাসভঙ্গিম গতি রতিকুশলা হাস্যময়ী লাট-ললনা। কিন্তু রল্লা—রল্লার জাতি নাই। তাহার তাম্র-কাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। সে নারী। আমার সমস্ত সত্তাকে সে তাহার নারীত্বের কুহকে জয় করিয়াছে।

একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম।

এক দিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই—লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুগুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে—কোনও মৃগনয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ! প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তার পর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।

শত শত নাগর নাগরিকা ওইরূপ প্রমোদে মত্ত—নিজের সুখে সকলেই নিমজ্জিত, অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর নাই। যৌবন চঞ্চল—বসন্ত ক্ষণস্থায়ী; এই স্বল্পকাল মধ্যে বৎসরের আনন্দ ভরিয়া লইতে হইবে। বৃহৎ কিংশুক বৃক্ষমূলে বেদীর উপর স্নিগ্ধ সুরভিত আসব বিক্রয় হইতেছে—পৈষ্টী গৌড়ী মাধ্বক—নাগরিক নাগরিকা নির্ব্বিচারে তাহা পান করিতেছে; অবসন্ন উদ্দীপনাকে প্রজ্বালিত করিয়া আবার উৎসবে মাতিতেছে। কঙ্কণ, নূপুর, কেয়ূরের ঝনৎকার, মাদলের নিক্কণ, লাস্য-আবর্ত্তিত নিচোলের বর্ণচ্ছটা, স্খলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজড়িত সঙ্গীত; নির্লজ্জ উন্মুক্ত ভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।

নগর-উপবনের বীথিপথে আমি একাকী ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মনের মধ্যে একটা নির্লিপ্ত সুখাবেশ ক্রীড়া করিতেছিল। এই সব রসোন্মত্ত নরনারী—ইহারা যেন নট-নটী; আমি দর্শক। সুরাপান করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক নয়। বসন্তের লঘু-আতপ্ত বাতাসের স্পর্শে বারুণী-জনিত উল্লাস যেন আমার চিত্তকে আত্মসুখলিপ্সার ঊর্দ্ধে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। চারিদিকে অধীর আনন্দ-বিহ্বলতা দেখিতেছিলাম, মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিতেছিল, আপনা আপনি উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিলাম, কিন্তু তবু এই ফেনোচ্ছল নর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছিলাম না। আমি সৈনিক, নাগরিক সাধারণ আমাকে কেহ চিনে না; তাই অপরিচয়ের সঙ্কোচও ছিল; উপরন্তু এই অপরূপ মধু-বাসরে বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই গাঢ়তর রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।

উপবনের মধ্যস্থলে কন্দর্পের মর্ম্মর-দেউল। স্মরবীথিকারা দেউল ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে, বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া লীলায়িত ভঙ্গিমায় উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিতেছে। তাহাদের স্বল্পবাস দেহের মদালস গতির সঙ্গে সঙ্গে বেণীবিসর্পিত কুন্তল দুলিতেছে, চপল মেখলা নাচিতেছে। চোখে চোখে মদসিক্ত হাসির গূঢ় ইঙ্গিত, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় অতর্কিত ভ্রূবিলাস, যেন মদনপূজার উপচার রূপে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুষ্পধন্বা মদনবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মদনের কিঙ্করীদের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল, তাহারা পুষ্প-শৃঙ্খলের মত আমাকে আবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তার পর তাহাদের মধ্যে একটি বিম্বাধরা যুবতী দ্বিধা-মন্থর পদে আমার সম্মুখে আসিল। আমার মুখের পানে চাহিয়া সে চক্ষু নত করিল, তারপর আবার চক্ষু তুলিয়া একটি চম্পক-

অঙ্গুলি দিয়া আমার উন্মুক্ত বক্ষ স্পর্শ করিল। দেখিলাম, তাহার কালো নয়নে কোন অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়িয়াছে।

আমি কৌতুকভরে আমার কুঞ্চিত কেশ-বন্ধন হইতে একটি অশোক-পুষ্প লইয়া তাহার চূড়া-পাশে পরাইয়া দিলাম,—তার পর হাসিতে হাসিতে নগরবধূদের বাহুরচিত নিগড় ভিন্ন করিয়া প্রস্থান করিলাম।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই মূক হইয়া রহিল। তার পর আমার পশ্চাতে বহু কলকণ্ঠের হাস্য বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। আমিও হাসিলাম, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলাম না।

ক্রমে দিবা নিঃশেষ হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে আবীর-কুঙ্কুমের খেলা আরম্ভ হইল। দিগ্বধূরাও যেন মদনমহোৎসবে মাতিয়াছে।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি মাধবীবিতানতলে প্রস্তরবেদীর উপর গিয়া বসিলাম। স্থান নির্জ্জন; অদূরে একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে বৃত্তাকার আধারে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মণি-মেখলাধৃত জলরাশি সায়াহ্নের স্বর্ণাভ আলোকে টলমল করিতেছে, কখনও রবিরশ্মিবিদ্ধ চূর্ণ জলকণা ইন্দ্র-ধনুর বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। যেন সুন্দরী রমণীর অধীর চঞ্চল যৌবন।

আলস্যস্তিমিত অন্যমনে আলোকের এই জলক্রীড়া দেখিতেছি এমন সময় সহসা একটি কুঙ্কুম-গোলক আমার বক্ষে আসিয়া লাগিল; অভ্র-আবরণ ফাটিয়া সুগন্ধিচূর্ণ দেহে লিপ্ত হইল। সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি নারী লতাবিতানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধবাক্ হইয়া গেলাম, বোধ করি হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল। তার পর হৃদয় উন্মত্তবেগে আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্ফারিত নেত্র তাহার দেহের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম।

তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তন্বী; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতিমাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লূতা জালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকুঞ্চিত নিচোল; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।

এই বিমোহিনী মূর্ত্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে ভয়ের মত একটা অনুভূতি গুরু গুরু করিতে লাগিল। সহসা আমার এ কি হইল? এই ত কিছুকাল পূর্ব্বে মদন-পূজারিণীদের নীরব সঙ্কেত হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি! কিন্তু এখন!

অবরুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে?'

তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভক্ত হইল, দশনপংক্তিতে বিজলী খেলিয়া গেল। বঙ্কিম কটাক্ষে ভ্রূ-ধনু বিলসিত করিয়া সে বলিল, 'আমি রল্লা।'

রল্লা! তাহার কণ্ঠস্বর ও নামোচ্চারণের ভঙ্গীতে আমার দেহে তীব্র বেদনার মত একটা নিপীড়ন অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল জানি না। হাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাসি আসিল না।

মদনোৎসবে অপরিচিত তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহারা কি করে? হাসিয়া পরস্পরের দেহে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে, দুই-চারিটা রঙ্গ-কৌতুকের কথা বলে, তার পর নিজ পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমি—মূঢ় গ্রামিকের মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে আবার প্রশ্ন করিলাম, 'কে তুমি?'

রল্লা ক্লান্তিবিজড়িত ভঙ্গীতে দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া দেহের আলস্য দূর করিল, তারপর বৃদ্ধকে বলিল, 'চল।'

তণ্ডু একবার লতাবিতানের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিল, একবার যেন একটু দ্বিধা করিল, তার পর বৃদ্ধ ভল্লুকের মত বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। রল্লা মন্থর পদে তাহার পশ্চাতে চলিল।

যাইতে যাইতে রল্লা একবার নিজের কবরীতে হাত দিল; কবরী হইতে একটি রক্ত কুরুবক খসিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি বাহিরে আসিয়া কুরুবকটি তুলিয়া লইলাম। রল্লা তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, দূর হইতে ফিরিয়া চাহিল। প্রদোষের ছায়াম্লান আলোকে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিঃশব্দ সঙ্কেত করিয়া আমাকে ডাকিল।

আমি দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। জনাকীর্ণ নগরীর বহু সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে রল্লা নগরপ্রান্তের এক দীন গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, গৃহের প্রাচীরে দুইটি অসি চিত্রিত রহিয়াছে।

তার পর নানা ছুতা করিয়া অসিধাবক তণ্ডুর গৃহে আসিয়াছি। অধীর দুনিবার অন্তরে স্থির হইয়া বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছি। তণ্ডুর যন্ত্রাগারের পশ্চাতে তাহার বাসগৃহ; সেখানে রল্লা আছে, দূর হইতে ক্বচিৎ তাহার নূপুরশিঞ্জন শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছি; চোখে মুখে উগ্র কামনা হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তণ্ডু কুটিল বক্র কটাক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রল্লাকে দেখিতে পাই নাই—একটা তুচ্ছ সঙ্কেত পর্য্যন্ত না—

* * * *

তণ্ডুর কর্কশ নীরস কণ্ঠস্বরে স্মৃতিতন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সচেতন হইয়া দেখিলাম, সে শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিতেছে,

আর কেশহীন ভ্রূ উত্থিত করিয়া শুষ্ক স্বরে কহিতেছে, 'অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্য, কি বলেন পত্তি-নায়ক ?'

বলিলাম, 'অসির ধার বটে। বনিতার লজ্জার কথা বলিতে পারি না, আমি অনূঢ়।'

'আমি বলিতে পারি, আমি অনূঢ় নহি—হা হা—' তণ্ডুর ওষ্ঠাধর তৃষ্ণার্ত্ত বায়সের মত বিভক্ত হইয়া গেল—'কিন্তু আপনি যদি অনূঢ়, তবে এত তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন ? পরস্ত্রীর ?'

আকস্মিক প্রশ্নে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম, সহসা উত্তর যোগাইল না। তণ্ডু কি সত্যই আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে ? আত্মসম্বরণ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম, 'কাহারও ধ্যান করি নাই, তোমার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতেছিলাম।'

বিকৃত হাস্য করিয়া তণ্ডু পুনশ্চ অসি অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিল, বলিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, আপনি সুন্দর যুবাপুরুষ, এই দীন অসিধাবকের কারু-নৈপুণ্য দেখিয়া আপনার কি লাভ হইবে ? বরং নগর-উদ্যানে গমন করুন, সেখানে বহু রসিকা নগর-নায়িকার কলা-নৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।'

আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই হীনজাত বৃদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলাম, 'আমি কোথায় যাইব-না-যাইব তাহা আমার ইচ্ছাধীন। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না।'

তণ্ডু আমার পানে একটা চকিত-গুপ্ত চাহনি হানিয়া আমার কার্য্যে মন দিল।

কিয়ৎকাল পরে বলিল, 'ভাল কথা, পত্তি-নায়ক, আপনি ত যোদ্ধা ; শত্রুর উপর অসির ধার নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছেন !'

গম্ভীর হাসিয়া বলিলাম, 'তা করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে দেবপাদ কণিষ্ক যখন তোমাদের এই উজ্জয়িনী নগরী অধিকার করেন, তখন নাগরিকের কণ্ঠে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিয়াছি।'

তণ্ডুর চক্ষু দুটা ক্ষণেক আমার মুখের উপর নিষ্পলক হইয়া রহিল; তার পর শীৎকারের মত স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, 'পত্তি-নায়ক আপনি বীর বটে। কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব কাহার?'

'কাহার?'

'আমার—এই হীনজন্মা অসিধাবকের। কে আপনার অসিতে ধার দিয়াছে? আমারই মার্জ্জিত অস্ত্রের সাহায্যে আপনারা আমার ভ্রাতা-পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করিয়াছেন।'

আমার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, 'শক-জাতি বর্ব্বর নয়। তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু নারীহরণ কদাপি করে নাই।'

তণ্ডু কণ্ঠে খলতার বিষ মিশাইয়া বলিল, 'বটে! তবে বোধ হয় শকজাতি পরস্ত্রীকে চুরি করিতেই পটু।'

ক্রোধের শিখা আমার মাথায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তণ্ডুর অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিলাম; সে আমার সহিত কলহ করিতে চাহে—যাহাতে আমি আর তাহার গৃহে না আসি। রল্লার লালসায় আমি তাহার গৃহে আসি ইহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিল কি করিয়া?

কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, তুমি বৃদ্ধ, তোমার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার অসি যদি তৈয়ার হইয়া থাকে, দাও।'

সে অসি জলে ডুবাইয়া আবার অঙ্গুলির সাহায্যে ধার পরীক্ষা করিল। বলিল, 'অসি তৈয়ার হইয়াছে।'

তণ্ডুর সহিত কলহ করিয়া আমার লাভ নাই। তাহাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'এই লও পঞ্চ নাণক—তোমার পুরস্কার।'

তণ্ডুর চক্ষু সহসা তাহার অঙ্গারকুণ্ডের মতই জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। সে চেষ্টাকৃত ধীর স্বরে বলিল, 'আমার পরিশ্রমের মূল্য এক নাণক মাত্র। বাকি চার নাণক আপনি রাখুন, অন্যত্র প্রমোদ ক্রয় করিতে পারিবেন।—কিন্তু অসির ধার পরীক্ষা করিবেন না?'

উদ্গত ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া আমি বলিলাম, 'করিব, দাও।' বলিয়া হাত বাড়াইলাম।

তণ্ডু কিন্তু অসি দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না, তির্য্যক চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পত্তি-নায়ক, নিজের উপর কখনও নিজের অসির ধার পরখ করিয়াছেন? করেন নাই! তবে এইবার করুন।'

বৃদ্ধের হস্তে আমার অসি একবার বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল। আমার শিরস্ত্রাণের উপর একটি শিখিপুচ্ছ রোপিত ছিল, দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল।

এইবার আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। এক লম্ফে প্রাচীর হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, বৃদ্ধ শৃগাল, আজ তোর কর্ণচ্ছেদন করব।' জ্বলন্ত ক্রোধের মধ্যে একটা চিন্তা অকস্মাৎ সূক্ষ্ম সূচীর মত মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করিল—তণ্ডুকে যদি হত্যা করি তাহাতেই বা দোষ কি? বরং আমার পথ পরিষ্কার হইবে।

কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া দেখলাম—কঠিন ব্যাপার। বিস্ময়ে আমার ক্রোধ ডুবিয়া গেল। জরা-শীর্ণ তণ্ডুর হস্তে অসি ঘুরিতেছে রথ-নেমির মত, অসি দেখা যাইতেছে না, কেবল একটা ঘূর্ণ্যমান প্রভা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আমি হটিয়া গেলাম।

গরলভরা স্বরে তণ্ডু বলিল, 'পত্তি-নায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল, লতামণ্ডপে লুকাইয়া চপলা পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করা সহজ, পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করা তত সহজ নয়।'

আবার তাহাকে আক্রমণ করিলাম। বুঝিতে বাকী রহিল না, তণ্ডু আরম্ভ হইতেই আমার অভিপ্রায় জানে। লতাবিতানে চুরি করিয়া আমাদের দেখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন প্রকাশ করে নাই কেন? আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল?

অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ বজ্র-নির্ঘোষের মত তণ্ডুর স্বর আমার কর্ণে আসিল,'অহিদত্ত রঞ্জুল, শক-লম্পট, এইবার নিজ অসির ধার নিজবক্ষে পরীক্ষা কর—'

তার পর—কি যেন একটা ঘটিয়া গেল।

অবাক হইয়া নিজের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, অসির শাণিত ফলক আমার বক্ষপঞ্জরে প্রোথিত হইয়া আছে!

তণ্ডু আমার পঞ্জর হইতে অসি টানিয়া বাহির করিয়া লইল। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। একটা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা যেন আমার চেতনাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর কোনও ক্লেশ অনুভব করিলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অনুভব করিলাম, তণ্ডু কর্কশ উল্লাসে বলিতেছে, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, রল্লা তোমাকে বধ করে নাই,—বধ করিয়াছে তণ্ডু—তণ্ডু—তণ্ডু—'

*   *   *   *

আমার দেহটার সহিত আমার যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আমাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বায়ুহীন কারা-কূপে আবদ্ধ বন্দীর মত প্রাণপণে মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতেছি। এই টানাটানি ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ মুক্তিলাভ করিলাম।

প্রথমটা কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। তণ্ডুর যন্ত্রগৃহে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমার পায়ের কাছে একটা বলিষ্ঠ রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর, তণ্ডু ঘরের কোণে খনিত্র দিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতেছে এবং ভয়ার্ত্ত চোখে বার-বার মৃতদেহটার পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে।

ক্রমে মনন শক্তি ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, তণ্ডু আমাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি ত মরি নাই! ঠিক পূর্ব্বের মতই বাঁচিয়া আছি। অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় ও হর্ষে মন ভরিয়া উঠিল।

অনুভব করিলাম, আরও কয়েক জন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও বা চিনিতে পারিলাম না। একজন আমার কাছে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'চল, এখানে থাকিয়া আর লাভ নাই।'

রল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি বদ্ধ কক্ষে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে; শুষ্ক চোখে ছুরির ঝলক, ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ দশনে অধর দংশন করিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া, তাহার অত্যন্ত কাছে দাঁড়াইয়াও আমার লেশ মাত্র বিকার জন্মিল না। সেই তপ্ত লালসা-ফেনিল উন্মত্ততা আর নাই। দেহের সঙ্গে দেহ-জাত আবিলতাও যেন ঝরিয়া গিয়াছে।

অতঃপর আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সময়ের প্রায় দুই সহস্র বর্ষব্যাপী এই জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার

স্বপ্নে আমি এই দু-হাজার বৎসরের জীবন বোধ হয় দুই ঘণ্টা বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাপন করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে গেলে দুই হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলাইবে না।

জীবিত মানুষ স্থান এবং কালের আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে প্রকট করে। কিন্তু প্রেতলোকে আত্মার স্থিতি কেবল কালের মধ্যে। নিরবয়ব বলিয়া বোধ করি তাহার স্থানের প্রয়োজন হয় না।

শরীর নাই ; তাই রোগ কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই। দেহ-বোধ প্রথম কিছু দিন থাকে, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। গতির অবাধ স্বচ্ছন্দতা আছে, অভিলাষমাত্রেই যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। সূর্য্যের জ্বলন্ত অগ্নি-বাষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, লেশমাত্র তাপ অনুভব করি নাই। শৈত্য-উত্তাপের একান্ত অভাবই এ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

এখানকার কালের গতিও পার্থিব কালের গতি হইতে পৃথক। পৃথিবীর এক অহোরাত্রে এখানে এক অহোরাত্র হয় না ; পার্থিব এক চান্দ্র মাসে আমাদের অহোরাত্র। এই কালের বিভিন্নতার জন্য পার্থিব ঘটনা আমাদের নিকট অতিশয় দ্রুত বলিয়া বোধ হয়।

অবাধ স্বচ্ছন্দতায় আমার সময় কাটিতে লাগিল। কোটি কোটি বিদেহ আত্মা এখানে আমারই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারী আছে, পুরুষ আছে ; সকলেই স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্রকার বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই শক্তির আধার কে জানি না ; কিন্তু তাহার নিঃশব্দ অনুশাসন লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখানে জ্ঞানের পথে বাধা নাই ; যাহার মন স্বভাবত জ্ঞানলিপ্সু সে যথেচ্ছ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। মর্ত্ত্যলোকে যে-জ্ঞান বহু সাধনায় অর্জ্জন করিতে পারা যায় না, এখানে

তাহা সহজে অবলীলাক্রমে আসে। আমি আমার ক্ষুদ্র মানবজীবনে যে-সকল মানসিক সংস্কার ও সংকীর্ণতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া গেল। অকলঙ্ক জ্ঞান ও প্রীতির এক আনন্দময় অবস্থার মধ্যে উপনীত হইলাম।

রবি চন্দ্র গ্রহ তারা ঘুরিতেছে, কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শনৈশ্চর শনিগ্রহ বোধ করি ষাট বারেরও অধিক সূর্য্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিল। তার পর একদিন আদেশ আসিল—ফিরিতে হইবে।

অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সূক্ষ্ম চন্দ্রকর অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলাম। হরিৎবর্ণ বিপুল শস্য-প্রান্তর চন্দ্রকরে দুলিতেছে ; পরমানন্দে তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া গেলাম।

আমার সচেতন আত্মা কিন্তু অস্তিত্ব হারাইল না—একটি আনন্দের কণিকার মত জাগিয়া রহিল।

তার পর এক অন্ধকারলোকে প্রবেশ করিলাম। স্থাণুর মন নিশ্চল, আত্মস্থ,—কিন্তু আনন্দময়।

সহসা একদিন এই যোগনিদ্রা ভাঙিয়া গেল। ব্যথা অনুভব করিলাম ; দেহানুভূতির যে যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই নূতন করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিল!

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল ; সেই শ্বাসরোধকর কারাকূপের ব্যাকুল যন্ত্রণা! তারপর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এই যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করিল—তীক্ষ্ণ ক্রন্দনের সুরে।

পাশের ঘর হইতে জলদমন্দ্র শব্দ শুনিলাম, 'লিখে রাখ। ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।'

মরু ও সঙ্ঘ

মধ্য-এশিয়ার দিক্‌সীমাহীন মরুভূমির মাঝখানে বালু ও বাতাসের খেলা। বিরামহীন অস্থির চঞ্চল খেলা। রাত্রি নাই, দিন নাই, সমগ্র মরুপ্রান্তর ব্যাপিয়া এই খেলা চলিতেছে।

খেলা বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর খেলা; অবোধ শিশুর খেলার মত প্রাণের প্রতি মমতাহীন ক্রূর খেলা। ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট ক্ষুদ্র নিয়মের এখানে মূল্য নাই; জীবনের কোনও মূল্য নাই। দয়া করুণা এখানে আপন শক্তিহীন ক্ষুদ্রতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কোনও বিধি-বিধান নাই। কখনও পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বায়ু ও বালুর দুর্লক্ষ্য ষড়যন্ত্রে একটি তৃণশ্যামল নির্ঝর-নিষিক্ত ওয়েসিস ধীরে ধীরে মরুভূমির জঠরস্থ হইতেছে; আবার কখনও একটি দিনের প্রচণ্ড বালু-ঝটিকায় তেমনই শ্যামল লোকালয়পূর্ণ ওয়েসিস বালু-স্তূপের গর্ভে সমাহিত হইতেছে। দূরে বহু দূরে হয়ত আর একটি নূতন ওয়েসিসের সূচনা হইতেছে। এমনিই অর্থহীন প্রয়োজনহীন ধ্বংস ও সৃজনের লীলা নিরন্তর চলিতেছে।

এই মরু-সমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি হরিদ্বর্ণ দ্বীপ—একটি ওয়েসিস। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তৃষ্ণাদীর্ণ ধূসর বালুপ্রান্তরের উপর এক বিন্দু নিবিড় শ্যামলতা আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কাছে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শতহস্তব্যাসবিশিষ্ট একটি শস্পাঞ্চিত স্থান কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষের ধ্বজা উড়াইয়া এখনও মরুভূমির নির্দ্দয় অবরোধ প্রত্যাহত করিতেছে। খর্জ্জুর-ছায়ার অন্তরাল দিয়া একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সঙ্ঘারামের

অর্দ্ধপ্রোথিত উর্দ্ধাঙ্গ দেখা যায়। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে প্রাকৃতিক নির্ম্মমতার কেন্দ্রস্থলে মহাকারুণিক বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘারাম মাথা জাগাইয়া আছে।

একদিন এই স্থান জনকোলাহলমুখরিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল—দশ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া নগর হাট উদ্যান চৈত্য বিরাজিত ছিল। শত ক্রোশ দূর হইতে সার্থবাহ বণিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য লইয়া মরুবালুকার উপর কঙ্কাল-চিহ্নিত পথ ধরিয়া এখানে উপস্থিত হইত। ক্ষুদ্র রাজ্যে একজন ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তাও ছিল; কিন্তু এখন আর কিছু নাই। এমন কি, যে কঙ্কালশ্রেণী মরুপথে বহির্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত, তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিঞ্চিদূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বালু ও বাতাস এই স্থানটিকে লইয়া নৃশংস খেয়ালের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। মরু এবং ওয়েসিসের সীমান্ত চিহ্নিত করিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষের সারি চক্রাকার প্রাকারের মত ওয়েসিসকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; এই সীমান্তভূমির উপর সূক্ষ্ম বালুকার পলি পড়িতে লাগিল। কেহ লক্ষ্য করিল না। দুই-তিন বৎসর কাটিল। সহসা এক দিন একটি উৎসের জলধারা শুকাইয়া গেল। লক্ষ্য করিলেও কেহ গ্রাহ্য করিল না। আরও অনেক উৎস আছে।

দশ বৎসর কাটিল। তার পর একদিন সকালে সত্রাসে হৃদয়ঙ্গম করিল—ওয়েসিস সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে; অলক্ষিতে মরুভূমি অনেকখানি সীমানা গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

অতঃপর ফাঁসীর দড়ি যে-ভাবে ধীরে ধীরে কণ্ঠ চাপিয়া প্রাণবায়ু রোধ করিয়া ধরে, তেমনই ভাবে মরুভূমি ওয়েসিসকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া আনিতে লাগিল। প্রথমে আহার্য্য পানীয়ের অপ্রতুলতা, তার পর বসবাসের স্থানাভাব হইল। যাহারা পারিল

পলায়ন করিল ; উষ্ট্র-গর্দ্দভপৃষ্ঠে যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া অন্য বাসস্থানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। যাহারা তাহা পারিল না, তাহারা শঙ্কাকুল চিত্তে মরুর পানে তাকাইয়া অনিবার্য্য পরিসমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জনপদের জনসংখ্যা অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়া গেল।

মরুভূমির ত্বরা নাই, ব্যস্ততা নাই। নাগ-কবলিত ভেকের ন্যায় ওয়েসিস অল্পে অল্পে মরুর জঠরস্থ হইতে লাগিল।

এক পুরুষ কাটিয়া গেল। যাহারা যুবক ছিল তাহারা এই অনির্ব্বাণ আতঙ্ক বুকে লইয়া বৃদ্ধ হইল। কিন্তু সৃষ্টির বিরতি নাই ; ধ্বংসের করাল ছায়ার তলে নবতর সৃষ্টি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন গ্রীষ্মের তাম্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে দিগন্তরাল হইতে কৃষ্ণবর্ণ আঁধি উঠিয়া আসিল। মরুভূমির এই আঁধির সহিত তুলনা করিতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছু নাই। মহাপ্রলয়ের দিনে শুষ্ক জীর্ণ পৃথিবী বোধ হয় এমনই উন্মত্ত বালু-ঝটিকার আবর্ত্তে চূর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

দুই দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া প্রখর সূর্য্য দেখা দিল। বিজয়িনী প্রকৃতির সগর্ব্ব হাসির আলোয় ওয়েসিস উদ্ভাসিত হইল। দেখা গেল ওয়েসিস আর নাই, পর্ব্বতপ্রমাণ বালুকার তলায় চাপা পড়িয়াছে ; কেবল উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘারামের অর্দ্ধনিমজ্জিত চূড়া ঘিরিয়া কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষ শোকার্ত্ত ভাবে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থল পাহারা দিতেছে। মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই।

দ্বিপ্রহরে সঙ্ঘের উপরিতলের একটি বালু-সমাহিত গবাক্ষ হইতে অতি কষ্টে বালুকা সরাইয়া বিবরবাসী সরীসৃপের ন্যায় দুইটি প্রাণী বাহির হইল। মানুষই বটে ; একজন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি বলিষ্ঠদেহ যুবা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুবা বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। তার পরে

উভয়ে বহুক্ষণ গবাক্ষের বাহিরে বালুর উপর পড়িয়া দীর্ঘ শিহরিত প্রশ্বাসে মুক্ত আকাশের প্রাণদায়ী বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের তৃষ্ণা-বিদীর্ণ অধরোষ্ঠে কালিমালিপ্ত মুখে মানুষী ভাব ফিরিয়া আসিল। চিনিবার মত কেহ থাকিলে চিনিতে পারিত, একজন সঙ্ঘস্থবির পিথুমিত্ত, দ্বিতীয় ভিক্ষু উচণ্ড। বালু-ঝটিকা আরম্ভ হইবার সময় সঙ্ঘের অন্যান্য সকলেই ভীত হইয়া বাহিরে আসিয়াছিল, তাহারা কেহ বাঁচে নাই; কেবল এই দুই জন সঙ্ঘের দ্বিতলস্থ পরিবেণে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন।

বালুকার স্তূপ ঢালু হইয়া সঙ্ঘের গাত্র হইতে নামিয়া গিয়াছে। উভয়ের বায়ু-ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তাঁহারা টলিতে টলিতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিলেন। বাঁচিতে হইলে জল চাই। সঙ্ঘের পাদমূলে খর্জ্জুরকুঞ্জের মধ্যে একটি প্রস্তরগুহা হইতে প্রস্রবণ নির্গত হইত, সেখানে দুই জনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রস্রবণের মুখ বুজিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বালুবন্ধ উৎসের স্বতঃপ্রবাহ রোধ করিতে পারে নাই। গুহামুখের বালুকা সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, সেই সিক্ত সিকতার উপর—দুইটি মানবশিশু। প্রথমটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, নিদ্রিত অথবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার মেরুসংলগ্ন জঠর ধীরে ধীরে উঠিতেছে পড়িতেছে। দ্বিতীয়টি অনুমান দেড় বৎসরের একটি বালিকা। শুভ্র নগ্নদেহে একাকিনী খেলা করিতেছে, খর্জ্জুর বৃক্ষের চ্যুত পক্ব ফল কুড়াইয়া খাইতেছে, আর নীল নেত্র মেলিয়া আপন মনে কলস্বরে হাসিতেছে। মৃত বা জীবিত আর কেহ কোথাও নাই। প্রকৃতির দুরবগাহ রহস্য। প্রভঞ্জনের ধ্বংস-তাণ্ডবের মধ্যে এই দুইটি সুকুমার জীবন-কণিকা কি করিয়া রক্ষা পাইল?

দুই ভিক্ষু প্রথমে বালু খনন করিয়া জল বাহির করিলেন। এক দণ্ড

কাল অঙ্গুলি সাহায্যে গুহামুখ খনন করিবার পর উৎসের পথ মুক্ত হইল—উভয়ে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে—খর্জ্জুর বৃক্ষের ছায়া পূর্ব্বদিগন্তের দিকে দীর্ঘতর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ অনাদি রহস্যের ইঙ্গিত জানাইতেছে। সঙ্ঘ-স্থবির পিথুমিত্ত একবার এই সমাধি-স্তূপের চারিদিকে চাহিলেন; উর্দ্ধে সঙ্ঘের বালু-মগ্ন শিখর, নিম্নে তরঙ্গায়িত বালুকারাশি দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে। তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর দুইটি ধারা গড়াইয়া পড়িল। শিশু দুটিকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত!'

অতঃপর মরুভূমির একান্ত নির্জ্জনতার মাঝখানে, বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘ-ছায়ায় এই চারিটি মানবজীবনের ক্রিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। স্থবির পিথুমিত্ত বালকের নাম রাখিলেন নির্ব্বাণ। বালিকার নাম হইল—ইতি।

* * * *

মাধবী পৌর্ণমাসীর প্রভাতে স্থবির পিথুমিত্ত সঙ্ঘের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া পাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছিলেন। সঙ্ঘের একমাত্র শ্রমণ, ভিক্ষু উচণ্ড তাঁহার সম্মুখে মেরু-যষ্টি ঋজু করিয়া স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন। শ্রোতা কেবল তিনিই।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর উভয়ের দেহেই কাল-করাঙ্ক চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। সঙ্ঘ-স্থবিরের বয়স এখন ন্যূনকল্পে সত্তর বৎসর। মুণ্ডিত মস্তকে মেদহীন চর্ম্মের আবরণতলে করোটির আকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া শুষ্ক দাড়িম্বফলের ন্যায় মনে হয়। চক্ষুতারকা বর্ণহীন, দৃষ্টিনিষ্প্রভ—যেন মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসে চোখের জ্যোতি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তবু, এই জরা-বিশীর্ণ মূর্ত্তির চারি পাশে জীবনব্যাপী সচ্চিন্তা

ও শুচিতার মাধুর্য্য একটি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শ্রী রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ত্রিতাপ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ভিক্ষু উচণ্ডের যৌবন আর নাই ; বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কিন্তু দেহ এখনও সবল ও দৃঢ়। সমান্তরালরেখা-চিহ্নিত ললাট-তটে ঘন রোমশ ভ্রূ দুই-একটি পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চোখের দৃষ্টি কঠোর ও বৈরাগ্যব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও তিনি পরাভব স্বীকার করেন নাই ; বিদ্রোহীর সদা-জাগ্রত যুযুৎসা তাঁহার ছিন্ন গলিত চীবর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে।

পাতিমোক্ষ পাঠ শেষ হইল। নিদান হইতে অধিকরণ শমথ পর্য্যন্ত বিবৃতি করিয়া পরিশেষে স্থবির বলিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার নিকট পারাজিক সংঘাদিশেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম আবৃত্তি করিলাম। শেষবার প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুক, আর যদি পাপ না করিয়া থাকেন, নীরব থাকুন।'

দীর্ঘ পাতিমোক্ষ পাঠ শুনিতে শুনিতে ভিক্ষু উচণ্ড বোধ করি আত্মস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথবা বিষয়ান্তরে তাঁহার মন সংক্রামিত হইয়াছিল ; স্থবিরের শেষ জিজ্ঞাসা কর্ণে যাইতেই তিনি চকিত হইয়া একবার নিজের উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ললাটের ভ্রূকুটি যেন ঈষৎ গভীরতর হইল। ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।

স্থবির তখন কহিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম আপনি পরিশুদ্ধ আছেন।' মনে হইল এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইল।

দিবা তখনও প্রথম প্রহর অতীত হয় নাই। অলিন্দপথে তির্য্যক

সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া কক্ষের ম্লান ছায়াচ্ছন্ন দূর করিয়াছে। উভয়ে এই তরুণ রবিকর অনুসরণ করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণাভ সিকতার পটভূমিকায় কয়েকটি আন্দোলিত খর্জ্জুরশীর্ষ চোখে পড়িল।

উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন।

সহসা উচণ্ড কহিলেন, 'থের, একটি কথা আপনাকে বলিবার অভিলাষ করিয়াছি। নির্ব্বাণকে উপসম্পদা দান করা কর্ত্তব্য; তাহার বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে।'

স্থবির উচণ্ডের মুখের পানে চাহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্ব্বাণের যথার্থ বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।'

উচণ্ডের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল, তিনি কহিলেন, 'এস্থলে অনুমানই যথেষ্ট।'

স্থবির ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'নির্ব্বাণ কি উপসম্পদা লইতে ইচ্ছুক?'

উচণ্ড কহিলেন, 'অবশ্য ইচ্ছুক। সঙ্ঘের উপাসকরূপে যে এত কাল আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্ঘেই সে পালিত ও বর্দ্ধিত, সঙ্ঘ ভিন্ন তাহার স্থান কোথায়?'

স্থবির আবার রবিকরোজ্জ্বল বহিঃপ্রকৃতির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' আবার মনে হইল একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

উচণ্ড তীক্ষ্ণ চক্ষে স্থবিরের পানে চাহিলেন; একবার যেন কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বাক্ সংযত করিয়া বলিলেন, 'উত্তম! তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিতেছি।' বলিয়া তিনি সঙ্ঘের বাহিরে চলিলেন।

গত পঞ্চদশ বৎসরে বিহারের বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, বালু-ঝটিকার পর যেমন অর্দ্ধপ্রোথিত ছিল তেমনই আছে। যে বিরাট বালুস্তূপ তাহাকে আবৃত করিয়াছিল তাহা হইতে মুক্ত করা দুই জন মানুষের সাধ্য নয়। উপরিতলের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ কোনক্রমে পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতেই ভিক্ষুদ্বয় শিশু দুইটিকে লইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সঙ্ঘের নিম্নতল চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সঙ্ঘ হইতে অবতরণ করিয়া উচণ্ড খর্জ্জুরকুঞ্জের দিকে চাহিলেন।

খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় গুহানিঃসৃত প্রস্রবণের মন্দ স্রোত স্বচ্ছ ধারায় বহিয়া গিয়াছে। কাকচক্ষু জল, মাত্র বিতস্তিপ্রমাণ গভীর, নিম্নে বালুকার আকুঞ্চিত স্তর দেখা যাইতেছে।

গুহামুখের সন্নিকটে নির্ব্বাণ অধোমুখে শয়ান হইয়া মৃদুপ্রবাহিত জল-ধারার প্রতি চাহিয়া ছিল, দুই বাহুর উপর চিবুক ন্যস্ত করিয়া অন্যমনে কি জানি চিন্তা করিতেছিল। খর্জ্জুরশাখার রন্ধ্রচ্যুত এক ঝলক রৌদ্র তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহার স্বর্ণাভ দেহবর্ণকে মার্জ্জিত ধাতুফলকের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। ঋজু নাতিমাংসল দেহে কেবল একটি শুভ্র বহির্ব্বাস, কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত আবৃত। উন্মুক্ত স্কন্ধ বাহু ও বক্ষ দৃঢ় পেশীবদ্ধ। মস্তকের কৃষ্ণ কেশ সর্পশিশুর মত মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া আছে। যৌবনের নবারুণ ঊষালোকে নির্ব্বাণের দেহকান্তি দেখিয়া গ্রীক ভাস্করের রচিত ভাস্কর-দেবতার মূর্ত্তি মনে পড়ে। কিন্তু তাহার মুখে ভাস্কর-দেবতার বিজয়দৃপ্ত গর্ব্বের ব্যঞ্জনা নাই; নবযৌবনের স্বাভাবিক পৌরুষের সহিত চিৎ-শক্তির এক অপরূপ করুণ মাধুর্য্য মিশিয়াছিল, গ্রীক ভাস্কর এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন না।

প্রস্রবণের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাণ চিন্তা করিতেছিল। কি গহন

দুরবগাহ তাহার চিন্তা সে নিজেই জানে না। নিষ্পলক দৃষ্টি অগভীর জলের স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে, আরও নিম্নে, পৃথিবীর কেন্দ্রগুহায় যেখানে কেবল নিরাসক্ত প্রাণধর্ম্মের ক্রিয়া চলিতেছে—বোধ করি সেইখানে উপনীত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির প্রতি তাহার মন ছিল না। কিন্তু তথাপি, এই অন্তর্মুখী তন্ময়তার মধ্যেও তাহার চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয় অলক্ষিতে সতর্ক উৎকর্ণ হইয়া ছিল।

সহসা তাহার বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস নির্গত হইল।

কিছু দিন যাবৎ নির্ব্বাণের মনে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা শিশুকাল হইতে একসঙ্গে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মনে পরস্পর সম্বন্ধে প্রায় কোনও মোহ থাকে না; নির্ব্বাণের মনেও ইতি সম্বন্ধে মোহ ছিল না। বরং ইতি স্ত্রীসুলভ নমনীয়তায় নির্ব্বাণকে পুরুষত্ব ও বয়োজ্যেষ্ঠতার মর্য্যাদা দিয়া সসম্ভ্রমে তাহার পিছন পিছন ঘুরিয়াছে। দুজনে কলহ করিয়াছে, আবার গলা জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইতির দেহে যৌবনের মুকুলোদ্গম হইয়াছে, আয়ত নীল চোখে সৃষ্টির অনাদি কুহক ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নির্ব্বাণের মনে ভাবান্তর আসে নাই। ইতি যে নারী এ অনুভূতি তাহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই। এই ভাবে পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়াছে। তারপর সহসা এক দিন নির্ব্বাণের মনের কৌমার্য্য পরিণত ফলের প্রান্ত হইতে শীর্ণ পুষ্পদলের মত খসিয়া গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নির্ব্বাণ একাকী খর্জ্জুরকুঞ্জে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে একটা ভ্রমরের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভ্রমরটা প্রতি বৎসর এই সময় কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, বহু দূরান্তর হইতে বোধ হয় বাতাসের মুখে বার্ত্তা পায়—মরুর খর্জ্জুরশাখায় ফুল ধরিয়াছে। কৃষ্ণকায় ভ্রমর,

পাখায় রামধনুর বর্ণ; সে গভীর গুঞ্জন করিয়া এক পুষ্পমঞ্জরী হইতে অন্য পুষ্পমঞ্জরীতে উড়িয়া যাইতেছে, নিঃশব্দে পুষ্পপাত্রে সঞ্চিত রস পান করিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। নির্ব্বাণ উজ্জ্বল কৌতূহলী চক্ষে মুগ্ধ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

সহসা ইতি পিছন হইতে আসিয়া দুই বাহু দ্বারা নির্ব্বাণের গলা জড়াইয়া ধরিল; উত্তেজনা-সংহৃত স্বরে তাহার কর্ণে বলিল, 'নির্ব্বাণ, একটা জিনিষ দেখিবে?'

ইতি স্বচ্ছন্দচারিণী মরুভূমির যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়; কোথায় বালুর তলে শাখাপত্রহীন মূল বা কন্দ লুক্কায়িত আছে, আহরণ করিয়া আনে। মরুর নিষ্প্রাণ বক্ষে যাহা কাহারও চক্ষে পড়ে না, তাহা ইতির চক্ষে পড়ে।

নির্ব্বাণ ভ্রমরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'কি?'

ইতি দুই হস্তে সবলে তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইল, বলিল, 'এস, দেখিবে এস।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া শবরীর মত নিঃশব্দ পদে লইয়া চলিল। নির্ব্বাণ দেখিল, আনন্দ-উদ্দীপনায় তাহার দুই চক্ষু নৃত্য করিতেছে।

ওয়েসিসের সীমান্ত পার হইয়া তাহারা মরুভূমির উপর বহুদূর গমন করিল। মধ্যাকাশে জলন্ত সূর্য্য, চারিদিকে কোটি কোটি বালুকণায় তাহার তেজ প্রতিফলিত হইতেছে। দুজনে নীরবে চলিয়াছে, মাঝে মাঝে ইতি নির্ব্বাণের মুখের পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া চুপি চুপি দু-একটি কথা বলিতেছে—যেন জোরে কথা বলিলেই তাহার রহস্যময় দ্রষ্টব্য বস্তু মায়ামৃগের ন্যায় মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইবে।

প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক পথ চলিবার পর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বালিয়াড়ি পড়িল। সেই বালিয়াড়ির কূর্ম্মপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতি দিগন্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ দেখ।'

অঙ্গুলির নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাণ সহসা বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল। দূরে দিগন্তরেখা যেখানে আকাশে মিশিয়াছে সেইখানে একটি হরিদ্বর্ণ উদ্যান,—শ্যামল তরুশ্রেণী বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, তৃণপূর্ণ প্রান্তরে মেষ-ছাগ চরিতেছে; এমন কি, আকাশে নানা আকৃতির পাখী উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ সঞ্চরমান বিন্দুর মত দেখা যাইতেছে। একটি নদী এই নয়নাভিরাম শ্যামলতার বুক চিরিয়া খরধার তরবারির মত পড়িয়া আছে।

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতির পর প্রতিক্রিয়া আসিল, নির্ব্বাণ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। ইতি অপেক্ষা তাহার জ্ঞান বেশী।

ইতি কিন্তু উত্তেজনার আতিশয্যে নির্ব্বাণের গলা বাহু বেষ্টিত করিয়া প্রায় ঝুলিয়া পড়িল, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দেখিতেছ? নির্ব্বাণ দেখিতেছ? কি সুন্দর! চল, আমরা দুই জনে ঐখানে চলিয়া যাই। আর কেহ থাকিবে না, শুধু তুমি আর আমি।—চল চল নির্ব্বাণ!'

স্মিতমুখে নির্ব্বাণ তাহার পানে চাহিল। ইতির পলাশরক্ত অধর নির্ব্বাণের এত নিকটে আসিয়াছিল যে, কিছু না বুঝিয়াই সে নিজ অধর দিয়া তাহা স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তোলপাড করিয়া উঠিল। দেহের অভ্যন্তর হইতে স্নায়ুর সীমান্ত পর্য্যন্ত একটা অনির্ব্বচনীয় তীক্ষ্ণ অনুভূতি অসহ্য হর্ষ-বেদনায় তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রথম চুম্বনের স্পর্শে ইতি দংশনোদ্যতা সর্পিণীর মত গ্রীবা পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া নির্ব্বাণের মুখের পানে চাহিল। মনে হইল তাহার নীল নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে। ক্ষণকাল এইভাবে থাকিয়া সে

দুরন্ত ঝড়ের মত আবার নির্ব্বাণের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একবার-দুইবার অগণিত বার নির্ব্বাণের অধর চুম্বন করিতে করিতে অবশেষে যেন নিজের দুর্জ্জয় আবেগের নিকট পরাজিত হইয়া শিথিল দেহে অবনত মুখে বালুর উপর বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত ঝড়ের অবসন্ন আক্ষেপের মত তাহার বক্ষ হইতে এক প্রকার অবরুদ্ধ আর্ত্তশ্বাস বাহির হইতে লাগিল!

নির্ব্বাণও জানু মুড়িয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় আবির্ভাবের সম্মুখে উভয়ে যেন বিমূঢ় হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ দুই জনে এই ভাবে অগ্নিবর্ষী আকাশের তলে বসিয়া রহিল। তারপর শুষ্ক তপ্ত চক্ষু তুলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। শ্যামল উপবন তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

অস্ফুট স্বরে নির্ব্বাণ বলিল, 'মরীচিকা।'

সেই দিন হইতে নির্ব্বাণের সহিত ইতির সহজ সরল সখ্যের অবসান হইল; নির্ব্বাণ যেন ইতিকে ভয় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে; তাহার সহিত কথা বলিতে রসনা জড়িত হয়, মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠে; অথচ অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাহাকে ইতির দিকে টানিতে থাকে। ইতির তপ্ত কোমল অধর স্পর্শের স্মৃতি মাদক সুরার মত তাহার চিত্তকে বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে। সে এই সর্ব্বগ্রাসী মোহের আক্রমণ হইতে দূরে নির্জ্জনে পলায়ন করিতে চায়।

ইতির মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; এত দিন সে নির্ব্বাণের খেলার সাথী ছিল, অনুজা সখী ছিল, আজ বিপুল নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে নির্ব্বাণকেও যেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবে পাইয়াছে। নির্ব্বাণ তাহারই,

আর কাহারও নয়,—নিজ অধর, দেহ, নারীত্বের নিক্তয়ে সে নির্ব্বাণকে আপন করিয়া লইয়াছে। এই চূড়ান্ত দাবির কাছে পৃথিবীর অন্য সমস্ত দাবী মাথা নীচু করিয়া থাকিবে।

তাহার আচরণ, এমন কি চাহনিতে ও দেহভঙ্গিমায় এই অবিসম্বাদী অধিকারের গর্ব্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। নারী ও পুরুষের প্রভেদ বোধ করি এইখানে।

ইহাদের অন্তরের এই বিপ্লব অন্য দুইজনের কাছেও গোপন রহিল না। মনুষ্য-সমাজে যাহা লজ্জা নামে পরিচিত তাহা ইতি কোনও দিন শিখে নাই, তাই তাহার মনের কথাটি কুণ্ঠাহীন অলজ্জিত আনন্দে প্রকাশ পাইল। পিথুমিত্তি ও উচণ্ড সব দেখিলেন, বুঝিলেন। স্থবিরের বর্ণহীন চক্ষু করুণায় নিষিক্ত হইয়া উঠিল; এত দিন যাহা আশঙ্কিত সম্ভাবনা ছিল, আজ তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। হায় তথাগত, সঙ্ঘের বৈরাগ্যভস্মের মাঝখানে এ কোন ভঙ্গুর সুকুমার পুষ্প ফুটাইয়া তুলিলে! ভিক্ষু উচণ্ডের কঠোর ললাটে কিন্তু আঁধির অন্ধকার পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি অন্তরমধ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, 'মার প্রবেশ করিয়াছে! সঙ্ঘে মার প্রবেশ করিয়াছে!'

প্রথম দিন হইতেই ক্ষুদ্র মানবিকা ইতির প্রতি ভিক্ষু উচণ্ডের মনে একটা বিমুখতা জন্মিয়াছিল। ভিক্ষুর মনে ভেদজ্ঞান থাকিতে নাই; কিন্তু ভিক্ষু উচণ্ড নির্ব্বাণকে কাছে টানিয়া লইলেন, ইতিকে দূরে দূরে রাখিলেন। নির্ব্বাণ ধর্ম্ম-বিনয়ে শিক্ষা পাইতে লাগিল, ইতি মরুবিহারিণী প্রকৃতিকন্যা হইয়া রহিল। ইতির দেহে যখন প্রথম যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইল, সর্ব্বাগ্রে উচণ্ডই তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার বিমুখতা গভীর আক্রোশে পরিণত হইল; ভিক্ষুর নিপীড়িত ব্যর্থ যৌবন যেন ইতির মূর্ত্তি ধরিয়া নিরন্তর তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। জর্জ্জরিত উচণ্ডের

মস্তিষ্কে সঙ্গীতের ধ্রুবপদের ন্যায় কেবল ধ্বনিত হইতে লাগিল—মার প্রবেশ করিয়াছে! মার প্রবেশ করিয়াছে!

নির্ব্বাণের প্রতিও তাঁহার আচরণ কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ইতি সর্ব্বদা নির্ব্বাণের সঙ্গে ঘুরিতেছে, এক দণ্ড উভয়ে পৃথক থাকে না। তাঁহার বক্ষে অগ্নিশলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। মার প্রবেশ করিয়াছে—ইতি নির্ব্বাণকে প্রলুব্ধ করিবে! তার পর? বুদ্ধের সঙ্ঘ ব্যভিচারের আগার হইয়া উঠিবে? কখনও না—কখনও না! উচণ্ড নির্ব্বাণকে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে হইতে লাগিল তিনি নির্ব্বাণকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষু জীবনের পরুষ নির্ম্মমতা নূতন করিয়া সঙ্ঘে প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

নিগৃহীত নিপীড়িত আকাঙ্ক্ষা যখন বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার স্বরূপ সকলে চিনিতে পারে না। সঙ্ঘে সত্যই মার প্রবেশ করিয়াছিল—কিন্তু কাহার দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ভিক্ষু উচণ্ড জানিতে পারেন নাই।

মরুভূমির স্বল্পায়ু বসন্ত এই ভাবে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে নির্ব্বাণ ও ইতির মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। তখন একদিন মাধব পূর্ণিমার প্রভাতে উচণ্ড নির্ব্বাণকে উপসম্পদা দান করিয়া পরিপূর্ণ রূপে সঙ্ঘের নিয়মাধীন করিবার প্রস্তাব করিলেন।

* * * *

প্রস্রবণের মুকুরোজ্জ্বল জলে একটি চঞ্চল ছায়া পড়িল। দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া নির্ব্বাণ উঠিয়া বসিল; ইতি আসিতেছে।

ইতির দেহে একটি মাত্র শ্বেতবস্ত্র। পঞ্চ হস্ত পরিমিত একটি দুকুল-পট্ট কটি ও নিতম্ব বেষ্টন করিয়া সম্মুখে বক্ষ আবরণ পূর্ব্বক গ্রীবার পশ্চাতে গ্রন্থিবদ্ধ রহিয়াছে; স্কন্ধ ও বাহুমূল উন্মুক্ত। তাহার রুক্ষ

কেশভার সুকৃষ্ণ নহে, রৌদ্ররশ্মি পড়িয়া অঙ্গারাবৃত অগ্নিশিখার ন্যায় আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে।

লঘুপদে সঙ্কীর্ণ পয়োধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইতি নির্ব্বাণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পশ্চাতে রাখিয়া বলিল, 'চক্ষু মুদিত কর।'

নির্ব্বাণ চক্ষু মুদিত করিল।

'হাঁ কর।'

নির্ব্বাণ মুদিত চক্ষে মুখ ব্যাদান করিল।

ইতি তাহার মুখে মুষ্টিধৃত গুবাক ফলের মত একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য পুরিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'এখন বল দেখি, কি খাইতেছ ?'

নির্ব্বাণ চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মেলিয়া বলিল, 'শর্করা-কন্দ। কোথায় পাইলে ?'

ইতি তখন নির্ব্বাণের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া কোথায় শর্করা-কন্দ পাইল তাহা বলিতে আরম্ভ করিল। বালুর নিম্নে মাটি আছে, নানা জাতীয় বিচিত্র বীজকণা সেখানে সঞ্চিত হয়। তার পর একদিন প্রকৃতির মন্ত্র-কুহকে অঙ্কুরিত হইয়া আলোকের সন্ধানে উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করে। কেহ বালু ভেদ করিয়া উঠিতে পারে, কেহ পারে না। বালুকার গর্ভে তাহাদের ফল-কন্দ বর্দ্ধিত হইয়া প্রচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। কিন্তু ইতির চক্ষে আবরণ পড়ে নাই। সে দেখিতে পায়। বালু খুঁড়িয়া এই সব রস-পরিপুষ্ট স্বাদু উদ্ভিজ্জ হরণ করিয়া আনে। খর্জ্জুর ভিন্ন যাহাদের অন্য খাদ্য নাই, তাহাদের মুখে ইহা অমৃততুল্য বোধ হয়।

সানন্দে চর্ব্বণ করিতে করিতে নির্ব্বাণ বলিল, 'তুমি খাও নাই ?'

ইতির চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত হইয়া আসিল, সে অধরোষ্ঠের একটি বিমর্ষ ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'আর কোথায় পাইব ? একটিমাত্র পাইয়াছিলাম।'

নির্ব্বাণের চর্ব্বণক্রিয়া বন্ধ হইল; সে ইতির প্রতি বিস্মিত চক্ষু ফিরাইল। ইতিও চক্ষু পাতিয়া পরম তৃপ্তিভরে নির্ব্বাণের বিস্ময়বিমূঢ় মুখ ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া লইল, তার পর কৌতুকবিগলিত কলহাস্য করিয়া তাহার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

নির্ব্বাণ এতক্ষণ যেন আত্মবিস্মৃত ছিল, এখন বিদ্যুদাহতের মত চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঠিক এই সময় পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর আহ্বান আসিল—'নির্ব্বাণ!'

প্রথমে নির্ব্বাণের মনে হইল, এই ধ্বনি যেন তাহার মস্তিকের মধ্যেই মন্দ্রিত হইয়াছে। তার পর সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মূর্ত্তিমান তিরস্কারের ন্যায় ভিক্ষু উচণ্ড বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

সভয়ে অপরাধ-কুণ্ঠিত দেহে নির্ব্বাণ উঠিয়া দাঁড়াইল। উচণ্ড অঙ্গারগর্ভ চক্ষু তাহার উপর স্থাপন করিয়া গভীর কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'ধিক্!'

নির্ব্বাণের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

উচণ্ড সঙ্ঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যাও! স্থবির তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন।'

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রস্থান করিল।

ইতি এতক্ষণ নির্ব্বাক বিভিন্ন-ওষ্ঠাধরে ভূমির উপর বসিয়া ছিল, এখন বিস্ফারিত নেত্র উচণ্ডের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ব্বাণ সঙ্ঘমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে উচণ্ড প্রজ্বলিত চক্ষু ইতির দিকে ফিরাইলেন, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, 'স্কন্ধ আবৃত কর।'

ইতি চকিতে নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল, তার পর আবার উচণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কণ্ঠলগ্ন বস্ত্র স্কন্ধের উপর প্রসারিত করিয়া দিল।

ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'সঙ্ঘের অলিন্দ পরিষ্কৃত করিয়াছ ?'

'হাঁ, অজ্জ, করিয়াছি।'

'জল সঞ্চয় করিয়াছ ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'ফল সংগ্রহ করিয়াছ ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

উচণ্ড অধর দংশন করিলেন। ইতিকে শাসনাধীনে আনা অসম্ভব—সে নারী, ভিক্ষুসঙ্ঘে ভিক্ষুণীর স্থান নাই। উচণ্ড তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত সঙ্ঘের অভিমুখে চলিলেন। ইতি দুই চক্ষে দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি লইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে নির্ব্বাণ স্থবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল, 'বন্দে।'

স্থবির তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে আশীর্ব্বচন করিলেন—'আরোগ্য।'

নির্ব্বাণের অপরাধ-সঙ্কুচিত চিত্ত বোধ হয় স্থবিরের নিকট তীব্র ভর্ৎসনা প্রত্যাশা করিতেছিল, তাই তাঁহার স্নেহসিক্ত বচনে তাহার হৃদয় সহসা দ্রবীভূত হইয়া গেল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে স্থবিরের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

স্থবির তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্ব্বাণ, তোমার উপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম তুমি উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী। ইহা সত্য ?'

নির্ব্বাণ যেন কূল পাইল, অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, আমাকে উপসম্পদা দান করিয়া সঙ্ঘে গ্রহণ করুন।'

স্থবির কিছুকাল নীরব রহিলেন; তার পর বলিলেন, 'নির্ব্বাণ, তুমি সদ্ধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছ; সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে নশ্বর আসক্তি কামনা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, ইহা নিশ্চয় তোমার অপরিজ্ঞাত নহে। সঙ্ঘের বিধি-বিধান অতি কঠোর, তুমি পালন করিতে পারিবে?'

এই সময় উচণ্ড প্রবেশ করিয়া নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; নির্ব্বাণ অবনত মস্তকে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, পারিব।'

'না পারিলে পাতিমোক্ষ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে—বিনয়পাঠে অবশ্য তাহা অবগত আছ?'

'আছি, ভদন্ত।'

স্থবির তখন করুণ বচনে বলিলেন, 'বৎস, ব্যাধতাড়িত পশু গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানব নিষ্কৃতির কামনায় ধর্ম্মের অনুরাগী হয়। বুদ্ধের সঙ্ঘ সেরূপ স্থান নহে। যাহার অন্তরে বৈরাগ্য এবং নির্ব্বাণ-তৃষ্ণা জন্মিয়াছে সে-ই সঙ্ঘের অধিকারী। তুমি এই সকল বিচার করিয়া উত্তর দাও।'

গলদশ্রু নির্ব্বাণ যুক্তকরে বলিল, 'আমি সঙ্ঘের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি—সংঘং শরণং গচ্ছামি। আমাকে উপসম্পদা দান করুন।'

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থবির বলিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

জলদগম্ভীর স্বরে উচণ্ড প্রতিধ্বনি করিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

অতঃপর বিধিমত প্রশ্নোত্তরদানপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ও ত্রি-চীবর ধারণ করিয়া কেশ মুণ্ডিত করিয়া নির্ব্বাণ ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সংসারে আর তাহার অধিকার রহিল না।

ভিক্ষু উচণ্ডই নির্ব্বাণের আচার্য্য রহিলেন ; নাম পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইল না। ছায়া পরিমাপ ইত্যাদি বিধি সমাপ্ত হইবার পর উচণ্ড বিজয়োদ্ধত কণ্ঠে কহিলেন, 'বুদ্ধ জয়ী হইয়াছেন, মার পরাভূত হইয়াছে। ভিক্ষু, নিজ পরিবেণে গমন কর। অদ্য হইতে নারীর মুখদর্শন তোমার নিষিদ্ধ।'

নতনেত্রে নির্ব্বাণ নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিল।

স্থবির নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, আমাদের ভ্রান্তি অপনোদন কর, অজ্ঞানমসী দূর কর, সম্যক্ দৃষ্টি দান কর—'

তিন দিন নির্ব্বাণ নিজ পরিবেণ হইতে বাহির হইল না। আর ইতি! দেহবিচ্ছিন্ন ছায়ার মত সে সঙ্ঘভূমির উপর দিবারাত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সঙ্ঘের প্রত্যেক অধিবাসীর পরিবেণ স্বতন্ত্র। সঙ্ঘারামের উপরিতলে যে-কয়টি প্রকোষ্ঠ ছিল তাহার একটিতে ইতি রাত্রিযাপন করিত ; অলিন্দের অন্য প্রান্তে তিনটি বিভিন্ন কক্ষে নির্ব্বাণ, উচণ্ড ও স্থবির বাস করিতেন। স্থবিরের অনুমতি ব্যতীত একের প্রকোষ্ঠে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

নির্ব্বাণের সহিত ইতির আর সাক্ষাৎ হয় না। ইতি সঙ্ঘের কাজ করে, আর নানা অছিলায় নির্ব্বাণের পরিবেণের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। কখনও দেখে, নির্ব্বাণ পুঁথি সম্মুখে লইয়া নিমগ্নচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে ; কখনও বা দেখিতে পায়, উচণ্ড তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। কদাচিৎ নির্ব্বাণ গবাক্ষের বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ইতির পদশব্দে তাহার চেতনা হয় না। ইতি নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া যায়।

ভিক্ষু উচণ্ডের মন কিন্তু শান্ত হইতেছেনা ; কোথাও যেন একটা মস্ত ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ যতই কঠোর ভাবে নিজেকে নিগৃহীত করিয়া সঙ্ঘ-ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাঁহার অন্তরে সংশয় ও দ্বন্দ্ব ততই মাথা তুলিতেছে। নির্ব্বাণকে সঙ্ঘের শাসনে আবদ্ধ করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না—ইতি ও নির্ব্বাণের মধ্যস্থিত আকর্ষণ-রজ্জু দূরত্বের ফলে দৃঢ়তর হইল মাত্র। কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ঈর্ষা ক্রমশ কণ্টক হইয়া উচণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল। আপন অজ্ঞাতে নির্ব্বাণকে তিনি নিবিড় ভাবে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন মধ্যরাত্রে চন্দ্রের আলোক গবাক্ষপথে নির্ব্বাণের পরিবেণে প্রবেশ করিয়াছিল ; অন্ধকার কক্ষে শুভ্র সূক্ষ্ম চীনাংশুকের মত এক খণ্ড জ্যোৎস্না যেন আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। নির্ব্বাণের চোখে নিদ্রা নাই, সে ঐ গবক্ষের দিকে চাহিয়া ভূ-শয্যায় শয়ান ছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি ; সঙ্ঘের কোথাও একটি শব্দ নাই। নির্ব্বাণ নিঃশব্দে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; তার পর ছায়ামূর্ত্তির মত অলিন্দ উত্তীর্ণ হইয়া সঙ্ঘের বাহিরে উপস্থিত হইল।

খর্জ্জুরকুঞ্জতলে জ্যোৎস্না-তরলিত স্বল্পান্ধকার যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ঊর্দ্ধে খর্জ্জুরশাখা ক্বচিৎ তন্দ্রালস মর্ম্মরধ্বনি করিতেছে। নিম্নে প্রস্রবণের উৎসমুখে উদ্গত জলের মৃদু কলশব্দ। চারি দিকে অপার মরুভূমির উপর চন্দ্ররশ্মির শীতল প্রলেপ। নির্ব্বাণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। এই দৃশ্য তাহার চিরপরিচিত ; কিন্তু আজ আর ইহার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই—সে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

'নির্ব্বাণ !'

প্রস্রবণের কলধ্বনির মতই মৃদু কণ্ঠস্বর। চমকিয়া নির্ব্বাণ ফিরিয়া চাহিল। শুভ্র বালুকার উপর বায়ুতাড়িত কাশপুষ্পের ন্যায় ইতি তাহার

পানে ছুটিয়া আসিতেছে! তাহার চরণ যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না; চন্দ্রকরকুহেলির ভিতর দিয়া স্মিত-ক্ষুধিত মুখখানি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

'না—না—না' দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া নির্ব্বাণ পলায়ন করিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অধোমুখে ভূতলে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় নির্ব্বাণের পদপাত সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয় নাই; অন্য পরিবেণে আর এক জনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

পরদিন মধ্যরাত্রে আবার চন্দ্ররশ্মি নির্ব্বাণের গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া দুর্নিবার শক্তিতে বাহিরের পানে টানিতে লাগিল। নির্ব্বাণ অনেকক্ষণ নিজের সহিত যুদ্ধ করিল—কিন্তু পারিল না। মোহগ্রস্তের মত খর্জ্জুরছায়াতলে গিয়া দাঁড়াইল।

'নির্ব্বাণ!'

ইতি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর নির্ব্বাণ পলাইল না; সমস্ত দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'নির্ব্বাণ, আর তুমি আমার সহিত কথা কহিবে না?'

নির্ব্বাণ উত্তর দিল না; কে যেন তাহার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে।

ইতি সশঙ্ক লঘু হস্তে তাহার বাহু স্পর্শ করিল।

'নির্ব্বাণ, আর তুমি আমার মুখ দেখিবে না?'

ইতির কণ্ঠস্বরে শক্তি নাই—ভাঙা ভাঙা অর্দ্ধোচ্চারিত উক্তি। নির্ব্বাণের স্নায়ু-কঠিন দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

'নির্ব্বাণ, একবার আমার পানে চাও'—ইতি চিবুক ধরিয়া নির্ব্বাণের মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

স্নায়ুপেশীর নিরুদ্ধ বন্ধন সহসা যেন ছিঁড়িয়া গেল; জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় নির্ব্বাণের উৎক্ষিপ্ত একটা বাহু ইতির মুখে গিয়া লাগিল। ইতি অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করিয়া অধরের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

নির্ব্বাণ ব্যাকুল চক্ষে একবার তাহার পানে চাহিল। তার পর—'না না—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—'

অন্ধের মত, উন্মাদের মত নির্ব্বাণ সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একজন অলক্ষিতে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার অশান্ত চিত্ত আশ্বস্ত না হইয়া আরও দুর্ব্বার ক্রোধে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মার পরাভূত হয় নাই। সঙ্ঘ অশুচি হইয়াছে। এ-পাপ দূর করিতে হইবে—নচেৎ বুদ্ধের ক্রোধানলে সঙ্ঘ ভস্মীভূত হইবে।

* * * *

কৃষ্ণাপঞ্চমীর ক্ষীয়মাণ চন্দ্র প্রায় মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

সঙ্ঘ নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও শব্দ নাই; বুঝি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় নির্ব্বাণ-সমাধিতে নিমগ্ন।

ভিক্ষু উচণ্ড স্থবিরের পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে গাত্রস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। সর্পশ্বাসবৎ স্বরে তাঁহার কর্ণে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

নিঃশব্দে দুইজনে ইতির প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্লান তির্য্যক কাক-জ্যোৎস্না কক্ষের মসৃণ ভূমির উপর প্রতিফলিত হইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে স্থবির দেখিলেন, ইতি একটি উচ্চ পীঠিকার উপর বসিয়া আছে; আর, দেবীমূলে প্রণতি-রত উপাসকের ন্যায় নির্ব্বাণ

নতদেহে তাহার জানুর উপর মস্তক রাখিয়া স্থির হইয়া আছে। ইতির কটি হইতে উর্দ্ধাঙ্গ কেবল বিস্রস্ত কেশজাল দিয়া আবৃত; শুভ্র মর্ম্মরে রচিত মূর্ত্তির ন্যায় তাহার যৌবন-কঠিন দেহ সগর্ব্বে উন্নত হইয়া আছে; আর দুই চক্ষু হইতে বিজয়িনীর নির্ব্বাধ উল্লাস ও অশ্রু একসঙ্গে ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে।

স্থবির ডাকিলেন, 'নির্ব্বাণ!'

নির্ব্বাণ ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার-সম্মুখে পিথুমিত্তকে দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, 'থের, আমি সঙ্ঘের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমার যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।'

স্থবির কম্পিত স্বরে কহিলেন, 'নির্ব্বাণ, তোমার অপরাধ গুরু। কিন্তু আমার অপরাধ তোমার অপেক্ষাও অধিক। আমি সব জানিয়া-বুঝিয়াও তোমাকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিয়াছিলাম বৎস!'

উচণ্ডের উগ্র কণ্ঠস্বরে স্থবিরের করুণাবাণী ডুবিয়া গেল, তিনি কহিলেন, 'থের, এই পতিত ভিক্ষু নিজমুখে পাপ খ্যাপন করিয়াছে, আমরাও স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন পাতিমোক্ষ অনুসারে উহার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করুন।'

স্থবির কোনও কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, অপরিসীম করুণায় তাঁহার অধর থর থর কাঁপিতে লাগিল।

উচণ্ড তখন কহিলেন, 'উত্তম, আমি এই ভিক্ষুর উপাধ্যায় ছিলাম, আমিই তাহার দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি। ভিক্ষু, তুমি পারাজিক ও সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইয়াছ, এই জন্য তুমি সঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইলে। অদ্য হইতে সঙ্ঘের সীমাভুক্ত ভূমির উপর বাস করিবার অধিকার তোমার রহিল না; সঙ্ঘাধিকৃত খাদ্য বা পানীয়ে তোমার অধিকার রহিল না। ইহাই তোমার দণ্ড—বহিষ্কার! তুমি এবং

তোমার পাপের অংশভাগিনী বুদ্ধের পবিত্র সঙ্ঘ ভুক্তি হইতে নির্ব্বাসিত হইলে।'

এই দণ্ডাদেশের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তবু কেহ কোনও কথা কহিল না। নির্ব্বাণ নত-মস্তকে সঙ্ঘের অমোঘ দণ্ডাজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইল। স্থবিরও মৌন রহিলেন। শুধু, পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ ও ইতিকে কোলে টানিয়া লইয়া তাঁহার শীর্ণ গণ্ডে যে অশ্রুর ধারা নামিয়াছিল, এতদিন পরে আবার তাহা প্রবাহিত হইল।

উষালোক ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ইতি ও নির্ব্বাণ সঙ্ঘ হইতে বিদায় লইল। সঙ্ঘের পাদমূলে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইতেছে তাহারা জানে না; এ যাত্রা কি ভাবে শেষ হইবে তাহাও অজ্ঞাত। কেবল, উভয়ের বাহু পরস্পর দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া আছে, দুস্তর মরু-পথের ইহাই একমাত্র পাথেয়।

যত দূর দেখা গেল, প্রাচীন নির্ব্বাপিত চোখে স্থবির সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সূর্য্য উঠিল, দূরে দুইটি কৃষ্ণ বিন্দু আলোকের ধাঁধায় মিলাইয়া গেল। স্থবির ভাবিতে লাগিলেন, এই সূর্য্য মধ্যাকাশে উঠিবে; তৃষ্ণা-রাক্ষসী প্রতীক্ষা করিয়া আছে—

উচণ্ড আসিয়া স্থবিরের পাশে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'থের, আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু গৃহীজনোচিত মমত্ব কি নির্ব্বাণ-লিপ্সু ভিক্ষুর সমুচিত?'

স্থবির কহিলেন, 'উচণ্ড, অদৃষ্টবিড়ম্বিতের প্রতি করুণা ভিক্ষুর পক্ষে নিন্দনীয় নহে। শাক্য সকল জীবের প্রতি করুণা করিতে বলিয়াছেন।'

'সত্য। কিন্তু সেই মহাভিক্ষু শাক্যই পাপীর দণ্ডবিধান পাতিমোক্ষ সৃজন করিয়াছেন। দণ্ডবিধির মধ্যে করুণার স্থান কোথায়? থের, এই সঙ্ঘ কেবল বাস্তব পাষাণ দিয়া গঠিত নয়, ভিক্ষুগণের নির্ম্মমত্বের কঠিনতর মর্ম্মর পাষাণে নির্ম্মিত। তাই সংসারের শত ক্লেদ-পঙ্কিলতার মধ্যে প্রকৃতির রুদ্র বিক্ষোভ উপেক্ষা করিয়া সঙ্ঘ আজিও অটল হইয়া আছে। সঙ্ঘের ভিত্তিমূল যদি করুণার অশ্রুপঙ্কে আর্দ্র হইয়া পড়ে, তবে ধর্ম্ম কয় দিন থাকিবে? করুণার যূপকাষ্ঠে নীতির বলিদান কদাপি মহাভিক্ষুর অভিপ্রেত ছিল না।'

স্থবির দীর্ঘকাল উত্তর দিলেন না; তার পর ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন, 'উচণ্ড, মহাভিক্ষুর অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি মনে করেন, পাতিমোক্ষ-মতে ভিক্ষুর দণ্ডদান অনুচিত হইয়াছে?'

'জানি না। বুদ্ধের ইচ্ছা দুরধিগম্য।'

'পাতিমোক্ষ কি বুদ্ধের ইচ্ছা নয়!'

'তাহাও জানি না।'

উচণ্ড তখন দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া গভীরকণ্ঠে বলিলেন, 'তবে বুদ্ধ নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করুন। গোতম, তুমি আমাদের সংশয় নিরসন কর। তোমার অলৌকিক শক্তির বজ্রালোকে সত্য পথ দেখাইয়া দাও।'

সেইদিন মধ্যাহ্নে বাতাস সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কেবল প্রজ্জ্বলিত বালুকার উপর হইতে এক প্রকার শিখাহীন অগ্নিবাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পঞ্চাগ্নি-পরিবেষ্টিত সঙ্ঘ যেন উগ্র তপস্যারত বিভূতিধূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহ্নিশ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের একপ্রান্ত

হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও একটি পক্ষী উড়িতেছে না। শব্দ নাই। চতুর্দ্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

মধ্যাহ্ন বিগত হইল; খর্জ্জুর বৃক্ষের ছায়া সভয়ে মূল ছাড়িয়া নির্গত হইবার উপক্রম করিল।

'থের!'

স্থবির অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উচণ্ড নীরবে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া দিক্‌প্রান্ত দেখাইলেন।

তাম্রতপ্ত আকাশের এক প্রান্তে চক্রবালরেখার উপর মুষ্টিপ্রমাণ কজ্জলমসী দেখা দিয়াছে। চিনিতে বিলম্ব হইল না। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে এমনই মসী-চিহ্ন আকাশের ললাটে দেখা গিয়াছিল।

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে উচণ্ড কহিলেন, 'থের, আঁধি আসিতেছে!'

স্থবিরের অধর একটু নড়িল, 'বুদ্ধের ইচ্ছা! বুদ্ধের ইচ্ছা!'

উন্মত্তের ন্যায় স্থবিরের জানু আলিঙ্গন করিয়া উচণ্ড কহিলেন, 'থের, তবে কি আমি ভুল করিয়াছি? তবে কি আমার পাপেই আজ সঙ্ঘ ধ্বংস হইবে? ইহাই কি বুদ্ধের অলৌকিক ইঙ্গিত।'

দেখিতে দেখিতে আঁধি আসিয়া পড়িল। মরুভূমি ঝঞ্ঝাবিমথিত সমুদ্রের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে স্থবিরের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল—তমসো মা জ্যোতির্গময়! তমসো মা জ্যোতির্গময়!'

উচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—' ক্ষিপ্তের মত তিনি অলিন্দ হইতে নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; ঝড়ের হাহারবে তাঁহার চীৎকার ডুবিয়া গেল।

বালু ও বাতাসের দুর্ম্মদ দুরন্ত খেলা চলিতে লাগিল। পৃথিবী প্রলয়ান্ত অন্ধকারে ছড়াইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ নিমজ্জিত হইল।

স্থবিরের শীর্ণ প্রাচীন কণ্ঠ হইতে তখনও আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত হইতেছে, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গোতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—'

মানবজাতির শমন-ধৃত কণ্ঠ হইতে আজিও ঐ আর্ত্ত বাণীই নিঃসৃত হইতেছে।

অষ্টম সর্গ

সে দিন সন্ধ্যার আকাশে দ্রুত সঞ্চরমান মেঘের দল শিপ্রার বর্ষাস্ফীত বক্ষে ধূমল ছায়া ফেলিয়া চলিয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতেছে না বটে, কিন্তু পশ্চিম হইতে খর আর্দ্র বায়ু বহিতেছে—শীঘ্রই বৃষ্টি নামিবে। ছিন্ন ধাবমান মেঘের আড়ালে পঞ্চমীর চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে,—যেন মহাকালের করচ্যুত বিষাণ খসিয়া পড়িতেছে, এখনই দিগন্তরালে অদৃশ্য হইবে।

শিপ্রার পূর্ব্বতটে উজ্জয়িনীর পাষাণ নির্ম্মিত বিস্তৃত ঘাট। ঘাটের অসংখ্য সোপান বহু ঊর্দ্ধ হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া শিপ্রার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, ক্ষিপ্র জল-ধারা এই পাষাণ প্রতিবন্ধকে আছাড়িয়া পড়িয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু শূন্য ঘাটে আজ শিপ্রার আক্ষেপোক্তি শুনিবার কেহ নাই।

ঘাট নির্জ্জন। অন্যদিন এই সময় বহু স্নানার্থিনীর ভিড় লাগিয়া থাকে; তাহাদের কলহাস্য ও কঙ্কণকিঙ্কিণী মুখর ভাবে শিপ্রাকে উপহাস করিতে থাকে; তাহাদের ঘটোচ্ছলিত জল মসৃণ সোপানকে পিচ্ছিল করিয়া তুলে। আজ কিন্তু ভিড় নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণী বধূ আকাশের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিয়া ঘট ভরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছে। কচিৎ এক ঝাঁক কিশোরী বয়স্যা মঞ্জীর বাজাইয়া গাগরী ভরিতে আসিতেছে; তাহারাও অল্পকাল জলক্রীড়া করিয়া পূর্ণঘট-কক্ষে চঞ্চল-চরণে সোপান আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে। নির্জ্জন ঘাটে সন্ধ্যার ছায়া আরও ঘনীভূত হইতেছে।

ঘাট নির্জ্জন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জনশূন্য নহে। একটি পুরুষ নিম্নতর

সোপানের এক প্রান্তে চিন্তামগ্ন ভাবে নীরবে বসিয়া আছেন। পুরুষের বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ কিম্বা ছত্রিশ বৎসর হইবে।—যৌবনের মধ্যাহ্ন। দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মস্তক মুণ্ডিত, স্কন্ধে উপবীত, ললাটে শ্বেত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। মেঘাচ্ছন্ন প্রাবৃট-সন্ধ্যার স্বল্পালোকেও তাঁহার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ নাসা ও আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি কখনও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখনও উদ্বেল-যৌবনা নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখনও ক্রীড়া-চপলা তরুণীদের রহস্যালাপ শ্রবণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার মুখ চিন্তাক্রান্ত। গত দুইদিন হইতে একটি দুরূহ সমস্যা কিছুতেই তিনি ভঞ্জন করিতে পারিতেছেন না। অলঙ্কারশাস্ত্র ঘাঁটিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এদিকে মহারাজ অবন্তীপতি ও সভাস্থ রসিক মণ্ডলী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ঘরে গৃহিণী তাঁহার ঔদাস্য ও অন্যমনস্কতায় সন্দিগ্ধা হইয়া উঠিতেছেন। নানা দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই মধুর আষাঢ় মাসেও রাত্রিতে নিদ্রা নাই!

কয়েকটি যুবতী এই সময় মঞ্জরী-ঝঙ্কারে অমৃতবৃষ্টি করিয়া সোপানশীর্ষ হইতে জলের ধারে নামিয়া আসিল। পুরুষকে কেহ লক্ষ্য করিল না,—উত্তরীয় কলস নামাইয়া রাখিয়া জলে অবতরণ করিল; কৌতুক-সরস আলাপ করিতে করিতে পরস্পরের দেহে জল ছিটাইতে লাগিল। পুরুষ একবার সচকিতে তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নতমুখে তাহাদের আলাপের ছিন্নাংশ শুনিতে লাগিলেন।

"কাল তোর বর দেশে ফিরিয়াছে—না? তাই—"

সমুচ্চ কলহাস্যে বাকী কথাগুলি চাপা পড়িয়া গেল।

"কি ভাই? কি হইয়াছে ভাই?"

"তুই আইবুড় মেয়ে—আমাদের সঙ্গে মিশ্‌বি কেন লা? তোকে কিছু বলিব না।"

"আহা বল্ বল্—ওর ত এই মাসেই বর আসিবে—ও এখন আমাদের দলে।..."

"মধু, মোম, কুঙ্কুম আর ইঙ্গুদী-তৈল মিশাইয়া ঠোঁটে লাগাস্—আর কোন ভয় থাকিবে না। সেই সঙ্গে একটু কেয়ার রেণুও দিতে পারিস্, কিন্তু খুব সামান্য..."

"ওলো ছাখ্ ছাখ্, কপোতিকার কি দশা হইয়াছে..."

পুরুষ আড়নয়নে দেখিলেন, কপোতিকা তাড়াতাড়ি আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিল।

"...লোলার কি দুঃখ ভাই! তাহার স্বামী আজিও ফিরিল না—কে জানে হয় ত—যবদ্বীপ কতদূর ভাই?"

"সিংহল পার হইয়া যাইতে হয়—ছয় মাসের পথ—লোলার জন্য বড় দুঃখ হয়—আমাদের সঙ্গে আসে না—"

"—ছাখ, মেঘগুলা আজ পূর্ব্বমুখে ছুটিয়াছে—"

"—হ্যাঁ। এ মেঘ অলকায় যাইবে না।"

পুরুষ কর্ণ উদ্যত করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর অধিক শুনিতে পাইলেন না। যুবতীরা গাত্র মার্জ্জনা সমাপন করিয়া তীরে উঠিল।

এই যুবতী যূথের মধ্যে একটিকে পুরুষ চিনিতেন। তাহারা বস্ত্র-পরিবর্ত্তন সমাপ্ত করিলে তিনি ডাকিলেন,—"ময়ূরিকে, তোমরা একবার এদিকে শুনিয়া যাও।"

চমকিত হইয়া সকলে মুখ ফিরাইল। বোধকরি একটু লজ্জাও হইল। তাই উত্তরীয় দ্বারা তাড়াতাড়ি অঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলিল।

ময়ূরিকা নিম্নকণ্ঠে পুরুষের নাম উচ্চারণ করিল,—নিমেষের মধ্যে চোখে চোখে একটা উত্তেজিত ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। তারপর সকলে সংযতভাবে পুরুষের সমীপবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল।

ময়ূরিকা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল,—"ভট্ট আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

ভট্ট স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"আয়ুষ্মতী হও।—তোমরা এতক্ষণ কি কথা কহিতেছিলে?"

সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। যে সকল কথা হইতেছিল, তাহা পুরুষকে, বিশেষতঃ ভট্টকে কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

মঞ্জরিকা ইহাদের মধ্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভা, সেই উত্তর দিল। কৌতুক-চঞ্চল-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"ভট্ট, আজ আকাশের মেঘদল পূর্ব্বদিকে চলিয়াছে। উত্তরে অলকাপুরীতে পৌঁছিতে পারিবে না, তাই আমরা আক্ষেপ করিতেছিলাম।"

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে জন্য আক্ষেপ কেন?"

মঞ্জরিকা বলিল,—"যক্ষপত্নী বিরহ-বেদনায় কালযাপন করিতেছেন, যক্ষের সংবাদ পাইবেন না,—এই জন্য আক্ষেপ।"

এতক্ষণে যেন বুঝিতে পারিয়াছেন এমনিভাবে ভট্ট বলিলেন,—"বুঝিয়াছি। তোমরা মেঘদূত কাব্যের কথা বলিতেছ। ভাল; তোমরা দেখিতেছি কাব্যশাস্ত্রে সুচতুরা। আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?"

সকলে যুক্তকরে বলিল,—"আজ্ঞা করুন।"

ভট্ট চিন্তা করিলেন; পরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—"না, সে বড় কঠিন প্রশ্ন, তোমরা পারিবে না।"

মঞ্জরিকা অনুনয় করিয়া বলিল,—"তবু আজ্ঞা করুন আর্য্য।"

ভট্ট সকলের চক্ষে অধীর কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"উত্তম, বলিতেছি শুন।—তোমরা বলিতে পার, কাব্যে নায়ক-নায়িকার বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর কবির আর কিছু বক্তব্য থাকে কিনা?"

সকলে বিস্মিতভাবে নীরব রহিল; ভট্ট যে তাহাদের মত অপরিণত-বুদ্ধি যুবতীদের নিকট কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা যেন সহসা ধারণা করিতেই পারিল না।

শেষে ময়ূরিকা বলিল,—"আর্য্য, নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিলেই ত কাব্য শেষ হইল। তাহার পর কবির আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?"

ভট্ট বলিলেন,—"ময়ূরিকে, আমি মিলনের কথা বলি নাই, বিবাহের কথা বলিয়াছি।

বিস্মিতা মঞ্জরিকা বলিল,—"উভয়ই এক নহে কি?"

ভট্ট গূঢ় হাসিয়া বলিলেন,—"উহাই ত প্রশ্ন।"

ভট্টের কথার মর্ম্ম কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সকলে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ভট্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত ভাবে রহিলেন।

অবশেষে অরুণিকা কথা কহিল। সে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুরা, এতক্ষণ কথা বলে নাই, এবার মুখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভট্ট এ প্রশ্নটি কখনও ভট্টিনীর নিকট করিয়াছিলেন কি?"

ভট্ট চমকিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলেন অরুণিকার অরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটু চাপা হাসি খেলা করিতেছে। তিনি ঈষৎ বিব্রতভাবে বলিলেন,—"না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, স্মরণ ছিল না। আজ গৃহে ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিব।—কিন্তু তোমরা আর বিলম্ব করিও না, এবার গৃহে যাও। রাত্রি আগত প্রায়।"

বক্রোক্তিটা সকলের কানে পৌঁছিল না ; শুধু অরুণিকা বুঝিল, ভট্ট মৃদু রকমের প্রতিশোধ লইলেন। সকলে যুক্তহস্তা হইয়া বলিল,—"আর্য্য, আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

ভট্ট হাসিলেন—"তোমাদের আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? আমি শঙ্করের দাস,—অথচ স্বয়ং শঙ্করারি তোমাদের সহায়। ভাল, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—" মুহূর্ত্ত-কাল নীরব থাকিয়া জলদগম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, "মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ।"

সকলে কপোতহস্তে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য্য করিল! তার পর প্রফুল্ল মনে প্রীতিবিম্বিমুখে শ্রোণি-কলস-ভার-মন্থর পদে প্রস্থান করিল।

ভট্ট বসিয়া রহিলেন। যুবতীদের নূপুরনিক্কণ ক্রমে শ্রুতি-বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন আবার তাঁহার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন হইল। কি করা যায়? এ প্রশ্নের কি সমাধান নাই? তীরে আসিয়া শেষে তরী ডুবিবে? অবশ্য এ কথা সত্য যে, নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিবার পর কবির কর্ত্তব্য শেষ হয়। কিন্তু তবু তাঁহার মন সন্তোষ মানিতেছে না কেন? কাব্য ত শেষ হইয়াছে ;—আর এক পদ অগ্রসর হইলে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন হইবে, যাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার অতিরিক্ত কথা বলা হইবে। তাহা করিবার প্রয়োজন কি? নায়িকার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটাইয়া বিদায় লওয়াই ত কবির উচিত ; আর সেখানে থাকিলে যে রসভঙ্গ হইবে। সবই ভট্ট বুঝিতেছেন, তবু তাঁহার মন উঠিতেছে না। কেবলি মনে হইতেছে,—এ হইল না, কাব্য শেষ হইল না, চরম কথাটি বলা হইল না।

এ দিকে রাত্রি মেঘের ধূসর পক্ষে আশ্রয় করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকও হয় নাই—মন বিক্ষিপ্ত। ভট্ট উঠিবার

চেষ্টা করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, কলস-কক্ষে একটি তরুণী নিঃশব্দে নামিয়া আসিতেছে। তাহার গতিভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল—যাহা দেখিয়া ভট্ট উঠিতে পারিলেন না, আবার বসিয়া পড়িলেন।

তরুণী ধীরে ধীরে কলস নামাইয়া সোপানের শেষ পৈঠায় আসিয়া বসিল। কোনও দিকে লক্ষ্য করিল না, বিষণ্ণ ব্যথিত চক্ষু দুটি তুলিয়া, যেখানে শিপ্রার স্রোত দূরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্ট দেখিলেন,—রমণীর দেহে সৌভাগ্যের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। রুক্ষকেশের রাশি একটি-মাত্র বেণীতে আবদ্ধ হইয়া অংসের উপর পড়িয়া আছে, শুষ্ক, অশ্রুহীন চোখে কজ্জল নাই।

এই নীরব শোকপরায়ণা একবেণীধরা যুবতীকে ভট্ট বালিকা-বয়সে চিনিতেন। সম্প্রতি বহুদিন দেখেন নাই। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু বক্ষে আনন্দের ক্ষণপ্রভাও খেলিয়া গেল। তিনি ডাকিলেন,—"লোলা!"

তন্দ্রাহতের ন্যায় যুবতী ফিরিয়া চাহিল। ভট্টকে দেখিয়া সলজ্জে উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া সঙ্কোচ-জড়িত-পদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্টের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, বস্ত্র ভেদ করিয়া দেহ ও দেহ ভেদ করিয়া মনের অন্তরতম কথাটি দেখিয়া লয়। লোলা কুণ্ঠিত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি রৈবতক নাবিকের বধূ?"

লোলা হেঁটমুখে রহিল, উত্তর করিল না। তাহার অধর কাঁপিতে লাগিল।

ভট্ট পুনরায় বলিলেন,—"তোমার স্বামী শ্রেষ্ঠী বরুণ মিত্রকে লইয়া গত বৎসর যবদ্বীপে গিয়াছে—আজিও ফিরে নাই?"

লোলার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে কেবল মাথা নাড়িল।

ভট্ট সুস্মিত মুখে বলিলেন,—"তুমি ভয় করিও না, রৈবতক কুশলে আছে।"

ব্যাকুল-নয়নে লোলা ভট্টের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টির কাতর বিহ্বল প্রশ্ন ভট্টের বক্ষে সূচীবেধবৎ বিঁধিল। তিনি লজ্জিত হইলেন,—ছি, ছি, এতক্ষণ এই বালিকার আকুল আশঙ্কা লইয়া তিনি খেলা করিতেছিলেন!

অনুতপ্তস্বরে বলিলেন,—"আজ রাজসভায় সংবাদ আসিয়াছে—রৈবতক সমস্ত নৌকা লইয়া সমুদ্র-সঙ্গমে ফিরিয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যেই গৃহে ফিরিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

থরথর কাঁপিয়া লোলা সেই খানেই বসিয়া পড়িল। তারপর গলদশ্রু-নেত্রে গলবস্ত্র হইয়া ভট্টকে প্রণাম করিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"দেব, আপনি আজ অভাগিনীর প্রাণ দিলেন। মহাকাল আপনাকে জয়যুক্ত করুন।" উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ সংবাদ আসিয়াছে?"

"হাঁ।"

"সকলে নিরাপদে আছেন?"

"হাঁ, সকলেই নিরাপদে আছেন।—লোলা, তুমি অনুপমা। রৈবতক আসিলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, তাহাকে তোমার কথা বলিব।"

অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া লোলা সিক্ত হাসি হাসিল, অস্ফুটস্বরে বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

এতক্ষণে শীকরকণার ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, বায়ুতাড়িত জলকণা তির্য্যকভাবে ভট্টের মুখে পড়িতে লাগিল।

তিনি উঠিলেন, সস্নেহস্বরে লোলাকে বলিলেন,—"লোলা, দুঃখের অন্তেই মিলন মধুর হয়। আমার উমাকে আমি যে দুঃখ দিয়াছি তাহা স্মরণ করিলেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়; কিন্তু চরমে সে ঈপ্সিত বর লাভ করিয়াছে। মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।—তুমিও আমার গৌরীর ন্যায় সুভগা। তোমার জীবনেও মদন পুনরুজ্জীবিত হইবেন। কল্য তাঁহার মন্দিরে পূজা পাঠাইও।"

লোলা কৃতাঞ্জলি হইয়া বসিয়া রহিল, ভট্টের সকল কথা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু অপরিমিত সুখাবেশে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভট্ট সহাস্যে তাহার মস্তকে একবার হস্তার্পণ করিয়া ত্বরিত পদে সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঘাট হইতে পথে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন, পথ পিচ্ছিল, কর্দ্দমপূর্ণ। সম্মুখেই মহাকালের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত গগনভেদী মন্দির মেঘলোকে চূড়া তুলিয়া আছে। ভট্ট সেইদিকে অগ্রসর হইতেই মন্দির-অভ্যন্তর হইতে ঘোর রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্ধ্যারতির কাল উপস্থিত। মন্দিরের অঙ্গনে বহু লোক আরতি দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ভট্ট ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ইষ্টদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টার রোল চলিতে লাগিল; কালাগুরু ধূপ ও গুগ্‌গুলের গন্ধ চারিদিকের বায়ুকে সৌরভে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

আরতি শেষ হইলে ভট্ট আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। অন্ধকার আকাশ হইতে তেমনই সূক্ষ্ম বারিপতন হইতেছে—রাজপথে লোক নাই। এখন রাত্রি হইয়াছে, অথচ পাষাণ-বনদেবীর হস্তে পথদীপ জ্বলে নাই; মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে বনদেবীগণ প্রদীপহস্তা হইবেন না। পথিপার্শ্বের সুবৃহৎ অট্টালিকা-সমূহে বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা অভ্যন্তর মাত্র

আলোকিত করিয়াছে ; কচিৎ নাগরিকদিগের বিলাস-কক্ষের মুক্ত গবাক্ষ-পথে আলোক-রশ্মি ও জাতী কদম্ব কেতকী যূথীর মিশ্র গন্ধ নির্গত হইয়া পথচারীকে গৃহের জন্য উন্মনা করিয়া তুলিতেছে। ভট্ট এই ঈষদালোকিত কর্দ্দম-পিচ্ছিল পুষ্পসুবাসিত পথ দিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ, কোন মতে দুইটি রথ বা প্রবহন পাশাপাশি চলিতে পারে। পথ ঋজু নহে, সংসর্পিত হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ভট্ট হেঁটমুণ্ডে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন—কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না ; সহসা একটা মোড় ঘুরিয়া সম্মুখে দীপোদ্ভাসিত প্রাসাদ-তোরণ দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

তোরণের পশ্চাতে প্রাসাদ, সেখানেও দীপোৎসব। তোরণ-সম্মুখে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রথ, দোলা, যানবাহন যাতায়াত করিতেছে। প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে সঙ্গীতের সুমিষ্ট ধ্বনি কানে আসিতেছে। ভট্টের স্মরণ হইল, আজ প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানক। স্বয়ং মহামাণ্ডলিক অবন্তীপতি এই সমাপানকে যোগদান করিবেন বলিয়াছেন। ভট্টেরও নিমন্ত্রণ আছে।

ভট্টের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! এ কথাটা তাঁহার এতক্ষণ মনে হয় নাই কেন ? তাঁহার নিদারুণ সমস্যার যদি কেহ সমাধান করিতে পারে ত সে ঐ মহাবিদুষী চতুঃষষ্টিকলার পারংগতা অলোক-সামান্যা বারবধূ প্রিয়দর্শিকা। তাহার মত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা অবন্তী-রাজ্যে অন্য কে আছে ? সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার কাব্যের নিগূঢ় রস ও ব্যঙ্গোক্তি প্রিয়দর্শিকা যতটা বুঝিবে, এত আর কেহ বুঝিবে না। সে সামান্যা রূপোপজীবিনী নহে—রাজ্যের বারমুখ্যা। স্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে পদার্পণ করিয়াই প্রিয়দর্শিকাকে

স্মরণ করেন; শুধু তাহার অলৌকিক রূপযৌবনের জন্য নহে, তাহার অশেষ গুণাবলির জন্য তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সেই প্রিয়দর্শিকার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলেন? ভট্ট সহর্ষে তোরণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তোরণের সমীপবর্ত্তী হইয়া ভট্টের মুখে ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া পড়িল। গৃহে ভট্টিনী প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তিনি এসব পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ প্রিয়দর্শিকাকে তিনি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। দেশে নিন্দুকের অভাব নাই, ভট্টের সহিত প্রিয়দর্শিকার গুপ্ত প্রণয়ের একটা জনশ্রুতি ভট্টিনীর কানে উঠিয়াছে। তদবধি তিনি প্রিয়দর্শিকার নাম শুনিলেই জ্বলিয়া যান। সুতরাং গণ্ডের উপর পিণ্ডের ন্যায় আজ যদি ভট্ট প্রিয়দর্শিকার গৃহে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত যাপন করেন, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভট্ট ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া তোরণ-পালিকা কিঙ্করীগণ কলকণ্ঠে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল,—"আসুন কবীন্দ্র! স্বাগত! আসুন, পণ্ডিতবর, আর্য্যা প্রিয়দর্শিকা আপনার জন্য অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আসুন মহাভাগ, আপনার অভাবে নবরত্নমালিকা আজ মধ্যমণিহীন। স্বাগত! শুভাগত!"

দাসীগণ সকলেই যৌবনবতী, রসিকা ও সুন্দরী। তাহাদের কাহারও হস্তে পুষ্পমালা, কাহারও হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, কেহ বা সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণ স্থালী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সকল অতিথিকেই মহা সম্মান-পূর্ব্বক স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়াছে; কিন্তু কবিকে দেখিয়া তাহারা যেরূপ সমস্বরে আহ্লাদে আহ্বান করিল, তাহাতে কবি আর দ্বিধা করিতে পারিলেন না। গৃহের চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিয়া হাস্যমুখে তোরণ-পথে প্রবেশ করিলেন।

মর্ম্মর-পট্টের উপর পদার্পণ করিবামাত্র একটি দাসী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, অন্য একজন নতজানু হইয়া বসিয়া পদ প্রক্ষালন করিয়া দিল। তৃতীয় দাসী শুভ্র কার্পাস বস্ত্র দিয়া পা মুছাইয়া দিল। কবিকে উজ্জয়িনীর নাগরিক-নাগরিকা যেরূপ ভালবাসিত, এরূপ আর কাহাকেও বাসিত না। তাই তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যের জন্য দাসীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

গন্ধদ্রব্যের স্থালী হস্তে দাসী কবির সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি অঙ্গুলির প্রান্ত চন্দনে ডুবাইয়া সকৌতুকে তাহার ভ্রূমধ্যে তিলক পরাইয়া দিলেন। সকলে আহ্লাদে হাস্য করিয়া উঠিল। যাহার হাতে পুষ্পমালা ছিল, সে আসিয়া তাড়াতাড়ি কবির গলায় যূথীর একটি স্থূল মালা পরাইয়া দিল। কবি তাহাকে ধরিয়া বলিলেন,—"সুলোচনে, এ কি করিলে? তুমি আমার গলায় মালা দিলে?"

সুলোচনাও বাক্যবিন্যাসে কম নহে, সে কুটিল হাসিয়া উত্তর করিল,—"কবিবর, এখানে আমরা সকলেই আর্য্যা প্রিয়দর্শিকার প্রতিনিধি।"

মুখের মত উত্তর পাইয়া কবি হাসিতে হাসিতে প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। উদ্যানের মধ্য দিয়া শ্বেত প্রস্তরের পথ, তাহার দুইধারে ধ্যানাসীন মহাদেবের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির শীর্ষস্থ জটাজাল হইতে সুগন্ধি বারি উৎসের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

প্রথম মহল নৃত্যশালা। সেখানে প্রবেশ করিয়া কবি দেখিলেন, তরুণ নাগরিকদের সভা বসিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে নর্ত্তকী বাহুবল্লরী বিলোলিত করিয়া অপাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া কেয়ুর-কিঙ্কিনী মঞ্জীর-শিঞ্জনে অপূর্ব্ব সম্মোহন সৃষ্টি করিয়া রাগ-দীপক নৃত্যে অপ্সরো-লোকের ভ্রান্তি বহিয়া আনিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চরণ-নিক্ষেপের

তালে তালে মৃদঙ্গ ও সপ্তস্বরা বাজিতেছে। মৃদঙ্গীর চক্ষু নর্ত্তকীর চরণে নিবদ্ধ; বীণা-বাদকের ললাটে ভ্রূকুটি, চক্ষু মুদিত। অন্য সকলে নর্ত্তকীর অপরূপ লীলা বিভ্রম দেখিতেছে। সকলেই গুণী রসজ্ঞ—কলা-সঙ্গীত বিশুদ্ধ নৃত্য দেখিতে দেখিতে তাহাদের চক্ষু ভাবাতুর। কেহ নড়িতেছে না, মূর্ত্তির মত বসিয়া দেখিতেছে।

কবি কিছুক্ষণ বসিয়া দেখিলেন, তার পর নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদ নৃত্যশালার সংলগ্ন, মধ্যে একটি অলিন্দের ব্যবধান। সেখানে গিয়া কবি দেখিলেন, কথা-কাহিনীর আসর বসিয়াছে। বক্তা স্বয়ং বেতাল ভট্ট। তিনি মণিকুট্টিমের মধ্যস্থলে শঙ্খরচিত কমলাসনে বসিয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া বহু নাগরিক-নাগরিকা করতলে চিবুক রাখিয়া অবহিত হইয়া শুনিতেছে। চষকহস্তা কিঙ্করীগণ পূর্ণ পানপাত্র সম্মুখে ধরিতেছে, কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কিঙ্করীরাও পাত্র হস্তে চিত্রার্পিতার ন্যায় গল্প শুনিতেছে।

বেতাল ভট্ট গম্ভীর কণ্ঠে কহিতেছেন—"পিশাচ অট্ট অট্ট হাস্য করিল; কহিল, মহারাজ, এই শ্মশান ভূমির উপর আপনার কোনও অধিকার নাই, ইহা আমার রাজ্য। ঐ যে নরমেদঃ-শোণিতলিপ্ত মহাশূল শ্মশানের মধ্যস্থলে প্রোথিত দেখিতেছেন, উহাই আমার রাজদণ্ড।"

কবি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, হাস্য গোপন করিয়া চুপিচুপি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে সকলের মুখ একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, কিন্তু প্রিয়দর্শিকাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন না।

তৃতীয় প্রাসাদটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরম্য। সভার ন্যায় সুবিশাল কক্ষ, তাহার চারিদিকে বহুবিধ আসন ও শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে, কেন্দ্রস্থলের মর্ম্মর-কুট্টিম অনাবৃত; তাহার উপর মণিময় অক্ষবাট অঙ্কিত

রহিয়াছে। ছাদ হইতে সুবর্ণ শৃঙ্খলে অগণিত দীপ ঝুলিতেছে, কক্ষ-প্রাচীরে সারি সারি দীপ, উপরন্তু হর্ম্যতলে স্থানে স্থানে স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে সুগন্ধি বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। কক্ষের কোথাও লেশমাত্র অন্ধকার নাই। এই কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কবির মনে হইল, কক্ষে বুঝি কেহ নাই—এত বিশাল এই কক্ষ যে সেখানে প্রায় ত্রিশজন লোক থাকা সত্ত্বেও উহা শূন্য মনে হইতেছে। সখী ও পরিচারিকাগণ ছায়ার মত গমনাগমন করিতেছে; তাহাদের নূপুরগুঞ্জনও যেন মৃদু ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া কবি দেখিলেন, মহারাজ অবন্তীশ্বর বররুচির সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় বসিয়াছেন। তাঁহাদের একপার্শ্বে রত্নখচিত সুরাভৃঙ্গার ও চষক, অন্য পার্শ্বে তাম্বুল-করঙ্ক। দুইজনেই খেলায় নিমগ্ন। কবি গিয়া দাঁড়াইতেই মহারাজ অন্যমনস্ক ভাবে চক্ষু তুলিয়া পাষ্টি ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন,—"কালিদাস? এস বন্ধু, সহায় হও। বররুচি আমার অঙ্গদ জিতিয়া লইয়াছে—এবার কঙ্কণ পণ—" বলিয়া পাষ্টি ফেলিলেন। গজদন্তের পাষ্টিতে মরকতের অক্ষি আলোকসম্পাতে ঝলসিয়া উঠিল।

রাজার আহ্বানে কালিদাস বসিলেন। অন্যদিন হইলে নিমেষমধ্যে তিনিও খেলায় মাতিয়া উঠিতেন; কিন্তু আজ তাঁহার মন লাগিল না। বিশেষ ইঁহারা দুই জনেই খেলায় এত একাগ্র যে, মাঝে মাঝে সুরাপাত্র নিঃশেষ করা ব্যতীত আর কোনও দিকে মন দিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কালিদাস উঠিলেন; ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলেন, দূরে নীল পক্ষ্মল চীনাংশুকের আস্তরণের উপর প্রিয়দর্শিকা বসিয়া আছে—যেন সরোবরের মাঝখানে একটি মাত্র কমল ফুটিয়াছে। তাহার সম্মুখে বসিয়া একজন পুরুষ হাত নাড়িয়া কি কথা বলিতেছে, পশ্চাৎ হইতে কালিদাস তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। প্রিয়দর্শিকা কপালে হস্ত রাখিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। কালিদাস

সেইদিকে ফিরিতেই দুইজনের চোখোচোখি হইল। প্রিয়দর্শিকা স্মিত হাসিয়া চোখের ইঙ্গিতে কবিকে ডাকিল।

কবি বুঝিলেন, প্রিয়দর্শিকা বিপদে পড়িয়াছে। তিনি মন্দমন্থর পদে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তি প্রিয়দর্শিকার সহিত কথা কহিতেছে, সে অত্যন্ত পরিচিত,—তাহার মুখ শূকরের ন্যায় কদাকার, দেহ রোমশ, মস্তকের কেশ কণ্টকবৎ ঋজু ও উদ্ধত। কবি মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—"কে ও? বরাহ—না না—মিহির ভট্ট যে! প্রিয়দর্শিকে, জ্যোতির্বিশারদ কি তোমার ভাগ্য-গণনা করিতেছেন?"

বাধাপ্রাপ্ত বরাহমিহির ক্রুদ্ধমুখে কবির দিকে ফিরিলেন। প্রিয়দর্শিকা যেন ইতিপূর্ব্বে কবিকে দেখে নাই, এমনিভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার কর্ণে নীলকান্ত-মণির অবতংস দুলিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল—"কবিবর, স্বাগতোঽসি। আপনার পদার্পণে আজ আমার গৃহে পরমোৎসব। আসন গ্রহণ করুন আর্য্য।—হলা বকুলে, শীঘ্র কবিবরের জন্য পানীয় লইয়া আয়।"

কালিদাস বসিলেন, বলিলেন,—"আচার্য্য মিহির, কিসের আলোচনা হইতেছিল? ফলিত জ্যোতিষ? উত্তম কথা, আমার ভাগ্যটা একবার গণনা করিয়া দেখুন ত। সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

বরাহমিহির মুখে হাসির একটা অনুকৃতি করিয়া বলিলেন,—"কবি, তুমি এখন বিনাইয়া বিনাইয়া একটা বর্ষা-সংহার কাব্য লেখ গিয়া। এ সব কথা তুমি বুঝিবে না।"

পরিচারিকা স্ফটিকপাত্রে আসব লইয়া আসিল, প্রিয়দর্শিকা তাহা স্বহস্তে লইয়া কবিকে দিল। কবি পান করিয়া পাত্র দাসীকে ফিরাইয়া

দিলেন, তারপর প্রিয়দর্শিকার হস্ত হইতে তাম্বুল লইয়া বলিলেন—"কেন বুঝিব না? জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্ত কি আছে? দ্বাদশ রাশি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র আর নবগ্রহ—এই লইয়া তো ব্যাপার। ইহাও যদি বুঝিতে না পারি—"

বরাহমিহির কবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রিয়দর্শিকার দিকে ফিরিয়া অসমাপ্ত বক্তৃতা আবার আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের অপৌরুষের শাস্ত্রের উপর এই অর্ব্বাচীন যাবনিক বিদ্যা বলাৎকার পূর্ব্বক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছে তাহা জান কি? অশ্বিন্যাদি বিন্দু পুরা তিন অংশ সরিয়া গিয়াছে।"

বরাহমিহির ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ নেত্রে প্রিয়দর্শিকাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন, যেন এই অপরাধের পরিপূর্ণ দায়িত্ব তাহারই—"তিন অংশ! কল্পনা কর—তিন অংশ! ইহার ফলে সমগ্র ভ-চক্র তিন অংশ সরিয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ হইতে আর বাকী কি? যে সকল গর্ভদাস এই কুকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জানে না যে আকাশচক্র রথচক্র নয়—উহা চিরস্থির চির-নিরয়ন। এই গ্রহতারা মণ্ডিত ব্যোম নিরন্তর ঘূর্ণমান হইয়াও অচল গতিহীন—"

কালিদাস হাসিয়া উঠিলেন; দেখিলেন বরাহ আজ যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, সহজে উহার কবল হইতে প্রিয়দর্শিকাকে উদ্ধার করা যাইবে না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"মিহির ভট্ট, ওটা আপনার ভুল। আকাশচক্র সত্যই রথচক্র—মহাকালের নিঃশব্দ ঘর্ঘরহীন রথচক্র। উহা নিরন্তর ঘুরিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমরাও ঘুরিতেছি।"

বরাহ কবির দিকে কেবল একটা কষায়িত নেত্রপাত করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—"শুধু কি তাই! এক দ্বাদশ রাশির অভিযানের

ফলে ফলিত জ্যোতিষ একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে! অভিজিৎ আজ কোথায়? অভিজিৎকে ছাগমুণ্ড করিয়া তাহার গলা কাটিয়া তাহাকে নক্ষত্রলোক হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে! দ্বাদশ রাশিকে সুতন্ত্রিত করিবার জন্য অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র এখন সপ্তবিংশতি হইয়াছে। দু'দিন পরে অভিজিতের নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া যাইবে—জ্যোতিঃশাস্ত্র মূর্খের দ্বারা লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত হইবে—"

শুনিতে শুনিতে কবি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। প্রিয়দর্শিকা তাঁহার প্রতি একবার করুণ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু উপায় নাই। দৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত উর্ব্বশীকে পুরূরবা উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ দৈত্য অবধ্য। বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতে করিতে কবি কক্ষে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাত্রিও ক্রমে গভীর হইতেছে; কবি ভাবিলেন, আজ আর কিছু হইল না, গৃহে ফিরি। এই সময় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কক্ষের দূর কোণ হইতে একব্যক্তি হস্ত-সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। লোকটি বোধহয় কিছু অধিক মাত্রায় মাদক-সেবা করিয়াছে, কারণ, আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না এবং যতই উঠিতে অসমর্থ হইতেছে, ততই আর এক চষক পান করিয়া শক্তি সংগ্রহে যত্নবান হইতেছে। তিনজন গূঢ়হাস্যমুখী দাসী তাঁহার আসব যোগাইতেছে।

লোকটি বৃদ্ধ, কিন্তু বেশভূষা নবীন নাগরিকের ন্যায়। দেহটি স্থূল, মুখ বর্ত্তুলাকার ও লোলমাংস; কিন্তু অতি যত্ন সহকারে অঙ্গ-সংস্কার করা হইয়াছে। চক্ষে কজ্জল, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, রোমশ দেহে পত্রচ্ছেদ্য—নব যুবক সাজিবার কোন কৌশলই পরিত্যক্ত হয় নাই। কালিদাস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি চক্ষু তুলিয়াই সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দাসীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

কালিদাস বৃদ্ধের পাশে বসিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন—"বটু, কি হইয়াছে ? এত কাতর কেন ?"

চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বৃদ্ধ স্খলিত বচনে কহিলেন—"বরাহমিহির একটা ষণ্ড !"

সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে কালিদাস বলিলেন—"সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কি হইয়াছে ?"

বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন—"বরাহমিহির একটা বৃষ !"

কবি বলিলেন,—"বটু, এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত। কিন্তু ব্যাপার কি—বৃষটা করিয়াছে কি ?"

ভগ্ন হৃদয় বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন—"বরাহমিহির একটা—"

"বলীবর্দ্দ !" কবি বৃদ্ধের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন,—"উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দঃ ঋষভো বৃষ ভো বৃষঃ" আমার কণ্ঠস্থ আছে—সুতরাং আবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন বলীবর্দ্দটার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

বৃদ্ধ আর এক চষক মদ্য পান করিলেন, তার পর কহিলেন—"কালিদাস, তুমি আমার প্রাণাধিক বয়স্য, তোমার সঙ্গে শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নাই। আমি প্রিয়দর্শিকার প্রেমে মজিয়াছি।"—এইখানে বৃদ্ধ আর এক চষক পান করিলেন—"তাহাকে যে কতবার কত মদনালঙ্কার উপহার দিয়াছি, কত সঙ্কেত জানাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুষ্টা আমাকে দেখিলেই 'তাত' বলিয়া সম্বোধন করে—এমন ছলনা দেখায় যেন আমার মনের ভাব বুঝিতেই পারে নাই !—আজ আমি সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়া ছিলাম, যে, প্রিয়দর্শিকার চরণে আত্মনিবেদন করিব—কোন ছল-চাতুরী শুনিব

না। কিন্তু আসিয়াই দেখিলাম, ঐ বরাহটা উহাকে কর-কবলিত করিয়াছে। সেই অবধি কেবলই সুযোগ খুঁজিতেছি, কিন্তু শূকরটা কিছুতেই উহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না।" বলিয়া সুরাবিহ্বল নেত্রে যতদুর সম্ভব বিদ্বেষ-সঞ্চার করিয়া যেখানে বরাহমিহির বসিয়া ছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাস দমন করিয়া কালিদাস কহিলেন—"বটু, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—প্রিয়দর্শিকার প্রতি প্রেমসঞ্চার তোমার পক্ষে অতীব গর্হিত। তুমি বালকমাত্র—প্রিয়দর্শিকা বর্ষীয়সী,—তাহার সহিত তোমার প্রণয় কদাপি যুক্তিযুক্ত নয়। তুমি বরঞ্চ তোমার বয়সোপযোগিনী কোনও কুমারী কন্যার প্রতি আসক্ত হও।"

বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"সে কথা যথার্থ। কিন্তু আমি প্রিয়দর্শিকাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর ফিরাইয়া লইতে পারি না।" তারপর কালিদাসের হস্ত ধারণ করিয়া কাতর ভাবে বলিলেন—"কালিদাস, তুমি আমার সখা, আজ সখার কার্য্য কর, ঐ শূকরটাকে প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে খেদাইয়া দাও। নতুবা বন্ধুহত্যার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।"

অকস্মাৎ একটা কূটবুদ্ধি কালিদাসের মাথায় খেলিয়া গেল। ঠিক হইয়াছে—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুধু প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে খেদাইয়া দিলে হইবে? আর কিছু চাহি না?"

"আর কিছু চাহি না।"

"ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখি।" কালিদাস উঠিলেন। কিছু দুর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"একটা কথা। বটু, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?" বৃদ্ধ বলিলেন—"পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাক্ বা না থাক্—

কালিদাস বলিলেন,—"না, না ওটা একান্ত আবশ্যক! বরাহমিহির আহ্নিক গতিতে বিশ্বাস করেন না।"

নিজের উরুর উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বটু বলিলেন—"তবে আমি বিশ্বাস করি। মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি—"

কবি হাসিয়া বলিলেন—"থাক, উহাতেই হইবে। একেবারে মিথ্যা বলিতে চাহি না।"

বরাহমিহির তখন নিজের বাগ্মিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন; কালিদাস তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃখিতভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন—"আর্য্য মিহির ভট্ট, বড়ই দুঃসংবাদ শুনিতেছি।"

বরাহমিহির বাক্যস্রোত সম্বরণ করিয়া কহিলেন—"কি হইয়াছে?"

কালিদাস উপবেশন করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ তাত অমর সিংহের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, আর্য্যভট্টের মীমাংসাই সত্য; পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে।"

মিহির ভট্ট শূকর দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সক্রোধে বলিলেন—"অমর সিংহ একটা নখদন্তহীন বৃদ্ধ ভল্লুক, তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।"

কালিদাস কহিলেন—"তিনি বলিতেছেন, যে, 'আহ্নিক' নামে একটি নূতন শব্দ শীঘ্রই অমরকোষে সংযোজিত করিবেন। তাহাতে আর্য্যভট্টের মীমাংসাই—"

মিহির ভট্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অর্দ্ধরুদ্ধ একটি গর্জ্জন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর—'জড়বুদ্ধি জরদ্গব!' 'শৌণ্ড!' 'উন্মাদ!' ইত্যাদি কটূক্তি করিতে করিতে অমর সিংহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রিয়দর্শিকা ও কালিদাস পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। এই বারাঙ্গনা ও কবির মধ্যে এমন একটি অন্তর্গূঢ় পরিচয় ছিল যে, একে

অঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মনের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিতেন। আজ কবির চিত্ত কোনও কারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রিয়দর্শিকা বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে সে-কথা না বলিয়া, শ্রদ্ধাবিগলিত অস্ফুট কাকলীতে কহিল—"কবি, অবলার দুঃখমোচনে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্য আপনার।—কিন্তু ওদিকে যে গজকূর্ম্মের যুদ্ধ বাধিল বলিয়া।"

কবি প্রাণে এক অপরূপ শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এই নারীর সাহচর্য্যই যেন তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া প্রিয়দর্শিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়দর্শিকা তাঁহার বাহুর নিম্নে সযত্নে একটি উপাধান ন্যস্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। কবির চোখে প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ শান্তি,—প্রিয়দর্শিকা কিছু বিচলিতা।

তারপর প্রিয়দর্শিকা চক্ষু নত করিল; তাম্বুল করঙ্ক কবির সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভট্টিনীর সংবাদ কি?"

কবি ঈষৎ চমকিত হইয়া তাম্বুল লইলেন, ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইল, বলিলেন—"ভট্টিনী? সংবাদ কিছু নাই, তিনি গৃহে আছেন।"

একটা দুঃসহ ক্ষোভের ছায়া প্রিয়দর্শিকার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তাহা নিমেষকালের জন্য। সে হাস্যমুখেই বলিল—"হায় কবি, এই সপ্তসাগরা পৃথিবী তোমার গুণে পাগল, কিন্তু তোমার গৃহিণী তোমাকে চিনিলেন না।"

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া কালিদাস বলিলেন—"চিনিলেন না! কিন্তু তিনি ত আমাকে—"

প্রিয়দর্শিকা পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথা-বিদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"আমি সব জানি কবি, আমার কাছে কোন কথা গোপন

করিবার চেষ্টা করিও না।” তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া চটুল স্বরে বলিল—“কিন্তু থাক্ ও কথা! আজ কবির ললাটে চিন্তারেখা দেখিতেছি কেন? যে কাব্য শেষ হইতে আর দেরী নাই বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি এখনও শেষ হয় নাই?”

কালিদাস উঠিয়া বলিলেন—“প্রিয়দর্শিকে, বড়ই বিপদে পড়িয়াছি,—গত তিন রাত্রি হইতে আমার নিদ্রা নাই। তোমার পরামর্শ চাহি।”

বিস্মিতা প্রিয়দর্শিকা বলিল—“কি ঘটিয়াছে?”

কালিদাস বলিলেন—“আমি যে কাব্য লিখিতেছি, তাহারই সংক্রান্ত ব্যাপার—অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে।”

আনন্দে প্রিয়দর্শিকার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্রে সে বলিল—“কবি, আপনি রসের অমরাবতীতে বিজয়ী বাসব, কল্পনার ধ্যান-লোকে আপনি শূলপাণি, আমি আপনাকে উপদেশ দিব? আমাকে লজ্জা দিবেন না।”

প্রিয়দর্শিকার জানুতে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কবি কহিলেন—“প্রিয়দর্শিকে, অবন্তীরাজ্যে যদি প্রকৃত রসের বোদ্ধা কেহ থাকে ত সে তুমি—এ কথা অকপটে কহিলাম। আর সকলে পল্লবগ্রাহী, মধুর শব্দে মুগ্ধ, বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট; রসের অতলে কেবল তুমিই ডুবিতে পারিয়াছ। তুমি ভাগ্যবতী।”

সজলনেত্রে যুক্তপাণি হইয়া প্রিয়দর্শিকা বলিল—“কবিবর, আমি সত্যই ভাগ্যবতী। কিন্তু কি আপনার সমস্যা, শুনি। কাব্য কি শেষ হয় নাই?”

কবি বলিলেন—"কাব্য শেষ হইতেছে কিনা, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিস্ময়-কৌতূহল-মিশ্রিত স্বরে প্রিয়দর্শিকা বলিল—"কাব্য শেষ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছেন না ? এ ত বড় অদ্ভুত কথা !"

কালিদাস আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া আগ্রহে বলিতে লাগিলেন—"এ পর্য্যন্ত অন্য কাহাকেও বলি নাই, তোমাকে প্রথম বলিতেছি, শুন। আমার কাব্যের নাম কুমারসম্ভব। স্বয়ং মহেশ্বর এই কাব্যের নায়ক—পার্ব্বতী নায়িকা। কাব্যের বিষয় এইরূপ—তারকাসুরের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, মহাদেবের ঔরসে স্কন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরকে সংহার করিবেন। সতীর দেহত্যাগের পর শঙ্কর তখন ধ্যানমগ্ন ; ও দিকে সতী হিমালয় গৃহে উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উমা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া হরের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহার তপোভূমিতে উপস্থিত হইলেন। হরের তপস্যা কিন্তু ভাঙ্গে না। তখন দেবগণ মদনকে তপস্যা ভঙ্গের জন্য পাঠাইলেন। মদন তপোভঙ্গ করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। মহাদেব তপোভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন। ভগ্নহৃদয়া উমা তখন পতি লাভার্থে কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মহেশ্বর প্রীত হইয়া উমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন ; তারপর উভয়ের বিবাহ হইল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কবি থামিলেন ! প্রিয়দর্শিকা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল।

কবি বলিলেন—"সপ্তম সর্গে আমি হরপার্ব্বতীর বিবাহ দিয়াছি। বধূর সলজ্জ মুখে হাসি ফুটিয়াছে—কন্দর্প পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। কুমারসম্ভব কাব্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কাব্যকলা-সঙ্গত ন্যায়ে কাব্য শেষ হইয়াছে—যথার্থ কি না ?"

প্রিয়দর্শিকা উত্তর করিল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবির প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কবি বলিলেন—"আমিও বুঝিতেছি যে শাস্ত্রমতে কাব্য এখানেই সমাপ্ত হওয়া উচিত! তথাপি মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে।"

"কিসের সন্দেহ?"

"মনে হইতেছে যেন কাব্য সম্পূর্ণ হইল না। উমা-মহেশ্বরের পূর্ব্বরাগ ও বিবাহ বর্ণনা করিলাম বটে, কিন্তু তবু কাব্যের মূল কথাটি অকথিত রহিয়া গেল। প্রিয়দর্শিকা তোমার কি মনে হয়? দেবদম্পতির বিবাহোত্তর জীবন চিত্রিত কথা কি কাব্যকলা সঙ্গত হইবে?"

প্রিয়দর্শিকা বলিল—"অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে হইবে না। প্রথমতঃ বিষয়াতিরিক্ত বর্ণনা বাগ্‌বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ জগৎপিতা ও জগন্মাতার দাম্পত্য-জীবন-বর্ণনা অতিশয় গর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইবে।"

কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তোমার মতে বিবাহ দিয়াই কাব্য শেষ করা কর্ত্তব্য?"

প্রিয়দর্শিকা দীর্ঘকাল করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল,—"কবি, কাব্যশাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। সত্যের অনুজ্ঞায় সকলেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই।"

কবি বলিলেন—"কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কাহাকে বলিতেছ?"

প্রিয়দর্শিকা বলিল,—"হরপার্ব্বতীর মিলনই সত্য।"

কবি বলিলেন,—"তাহাই যদি হয় তবে সে সত্য ত পালিত হইয়াছে।"

"হইয়াছে কি?"

"হয় নাই?"

"তাহা আমি বলিতে পারিব না; উহা কবির অন্তরের কথা।"

কবি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আমার অন্তরের কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না—তাই এই সংশয়। তোমার অভিমত কি বল।"

প্রিয়দর্শিকা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"আমার অভিমত শুনিবেনই ?"

"হ্যাঁ ?"

"না শুনিয়া নিরস্ত হইবেন না ?"

"না।"

"ভাল। আজ আপনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন—রাত্রি গভীর হইয়াছে। কাল প্রাতে যদি আপনার মনে কোনও সংশয় থাকে, আমার অভিমত জানাইব।"—বলিয়া প্রিয়দর্শিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কবি ঈষৎ নিরাশ হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রিয়দর্শিকা তোরণদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। বিদায়কালে কবি বলিলেন—"চলিলাম। মিহির ভট্ট ও অমরসিংহ হইতে দূরে দূরে থাকিও। আর কথাটা চিন্তা করিয়া দেখিও।" দুইজনের চোখে চোখে স্মিতহাস্য বিনিময় হইল।

প্রিয়দর্শিকা বলিল—"দেখিব।"

কবি যখন নিজগৃহ দ্বারে পৌছিলেন, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ—অন্ধকার। কবি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও শব্দ পাইলেন না। বোধহয় সকলে নিদ্রিত।

তিনি কবাটে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"কে ?"

কবি কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর করিলেন—"আমি—কালিদাস।"

গৃহের কবাট খুলিল—কবি সভয়ে দেখিলেন প্রদীপ হস্তে স্বয়ং গৃহিণী !

গৃহিণী কহিলেন—"আসিয়াছ ? এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?"

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কবি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন—"প্রিয়ে, তুমি এতক্ষণ জাগিয়া আছ কেন? দাসীকে বলিলেই ত—"

কবিপত্নী কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?"

সঙ্কুচিত হইয়া কবি কহিলেন—"সমাপানকে গিয়াছিলাম—"

কবিপত্নীর অবরুদ্ধ ক্রোধ এতক্ষণে ফাটিয়া পড়িল, তিনি প্রজ্বলিত নেত্রে কহিলেন—"প্রিয়দর্শিকার গৃহে গিয়াছিলে! বল বল, লজ্জা কি? কেহ নিন্দা করিবে না। তুমি মহাপণ্ডিত, তুমি সভাকবি, তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপন করিয়াছ তাহাতে আর লজ্জা কি?"

"প্রিয়ে—"

"ধিক্! আমাকে প্রিয়সম্বোধন করিতে তোমার কুণ্ঠা হয় না? কে তোমার প্রিয়া? আমি—না ঐ সহস্রভোগ্যা পথকুক্কুরী প্রিয়দর্শিকা?"

কবি নিরুত্তর দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নীরবতা কবিপত্নীর ক্রোধে ঘৃতাহুতি দিল—"ধিক্ মিথ্যাচারী! ধিক লম্পট! কি জন্য রাত্রি শেষে গৃহে আসিয়াছ? বেশ্যার উচ্ছিষ্টভোগীকে স্পর্শ করিলে কুলাঙ্গনাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়! যাও—গৃহে তোমার কি প্রয়োজন? যেখানে এতক্ষণ ছিলে, সেইখানেই ফিরিয়া যাও!"—এই বলিয়া কবিপত্নী শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অন্ধকারে কবি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই তাঁহার গৃহ। এই তাঁহার ভার্য্যা। গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা! গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কবি ফিরিলেন। যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া কাব্য-রচনা করিতেন সেই প্রকোষ্ঠে গিয়া দীপ জ্বালিলেন।

মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া উপবেশন করিতেই অদূরে কাষ্ঠাসনে রক্ষিত কুমার-

সম্ভবের বৃহৎ পুঁথির উপর দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় আকস্মিক প্রভা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে খেলিয়া গেল। প্রিয়দর্শিকা ঠিক বুঝিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—"কাল প্রাতে যদি কোনও সংশয় থাকে—।" না তাঁহার মনে আর লেশমাত্র সংশয় নাই। পত্নীর সহিত সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস উঠিলেন। প্রদীপদণ্ড আনিয়া আসনপার্শ্বে রাখিলেন, কাষ্ঠাসন-সমেত পুঁথি সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মসীপাত্র, লেখনী ও তালপত্র পাড়িয়া আবার আসিয়া বসিলেন।

ক্রমে তাঁহার মুখের ভাব স্বপ্নাচ্ছন্ন হইল। লেখনী মুষ্টিতে লইয়া তাল-পত্রের উপর পরীক্ষা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে লিখিলেন—'অষ্টমঃ সর্গঃ।'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া অতি দীর্ঘকাল দৃষ্টিহীননয়নে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাহিরে তামসী রাত্রি, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু কবির মানসপটে যে চিত্রগুলি একে একে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বসন্তের গন্ধে বর্ণে কাকলীতে সমাকুল—বর্ষা রজনীর শ্যামসজল ছায়া তাহার অম্লান দীপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

সহসা অবনত হইয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, শরের লেখনী তাল পত্রের উপর শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল 'পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্—'

বিষকন্যা

১

যে কালের উপর চিরবিস্মরণের পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে, সেকালে মিলনোৎকণ্ঠিতা নবযৌবনা নাগরী যখন সন্ধ্যাসমাগমে ভবনশীর্ষে উঠিয়া কেশপ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার স্বর্ণমুকুরে যে উৎফুল্ল-উৎসুক স্মিত-সলজ্জ মুখের প্রতিবিম্ব পড়িত, তাহা এ কালেও আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। চিরন্তনী নারীর ঐ মূর্ত্তিটিই শুধু শাশ্বত—যুগে যুগান্তরে অচপল হইয়া আছে। কেবলমাত্র ঐ নিদর্শন দ্বারাই তাঁহাকে সেই নারী বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি।

কিন্তু অন্য বিষয়ে—?

সে যাক। প্রসাধনরতা সুন্দরীর দ্রুত অধীর হস্তে গজদন্ত-কঙ্কতিকা কেশ কর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে। ক্রমে দুটি একটি উন্মূলিত কেশ কঙ্কতিকায় জড়াইয়া যায়,—প্রসাধনশেষে সুন্দরী কঙ্কতিকা হইতে বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া অন্যমনে দুই চম্পক-অঙ্গুলীর দ্বারা গ্রন্থি পাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। ক্ষুদ্র কেশগ্রন্থি অবহেলার লক্ষ্যহীন বায়ুভরে উড়িয়া কোন্ বিস্মৃতির উপকূলে বিলীন হইয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে?

তেমনই, বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একদা কয়েকটি মানুষের জীবন-সূত্র যে ভাবে গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না। মহাকালভুজগের যে বক্ষচিহ্ন একদিন ধরিত্রীর উপর অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ী চিরনবীনা, বৃদ্ধ অতীতের ভোগ-লাঞ্ছন সে চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে ভালবাসে না।

নিত্য নব নব নাগরের গৃহে তাহার অভিসার। হায় বহুভর্তৃকা, তোমার প্রেম এত চপল বলিয়াই কি তুমি চিরযৌবনময়ী ?

দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল, যে কয়টি স্বল্পায়ু নর-নারীর জীবনসূত্র সুন্দরীর কুটিল কেশকুণ্ডলীর মত জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। লিখিতে বসিয়া একটা বড় বিস্ময় জাগিতেছে। জন্মজন্মান্তরের জীবন ত আমার নখদর্পণে, সহস্র জন্মের ব্যথা-বেদনা আনন্দের ইতিহাস ত এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তবু যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার বিগত জীবনের আলোচনা করি না কেন, দেখিতে পাই, কোনও না কোনও নারীকে কেন্দ্র করিয়া আমার জীবন আবর্ত্তিত হইয়াছে ; জীবনে যখনই কোনও বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহা এক নারীর জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। নারীদ্বেষক হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু তবু নারীকে এড়াইতে পারি নাই। বিস্ময়ের সহিত মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—পৃথিবীর শত কোটি মানুষের জীবন কি আমারই মত ? ইহাই কি জীবনের অমোঘ অলঙ্ঘনীয় রীতি ? কিম্বা—আমি একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম ?

ন্যূনাধিক চব্বিশ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। বুদ্ধ তথাগত প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। উত্তর ভারতে চারিটি রাজ্য ;—কাশী কোশল লিচ্ছবি ও মগধ। চারিটি রাজ্যের মধ্যে বংশানুক্রমে অহি-নকুলের সম্বন্ধ স্থায়িভাব ধারণ করিয়াছে। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে শিশুনাগ-বংশীয় এক অশ্রুতকীর্ত্তি রাজা অধিরূঢ়।

শিশুনাগবংশের ইতবৃত্ত পুরাণে আদ্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পায় নাই, অজাতশত্রুর পর হইতে কেমন যেন এলোমেলো হইয়া

গিয়াছে। তাহার কারণ, অমিতবিক্রম অজাতশত্রুর পর হইতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত মগধে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চলিয়াছিল। পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করা শিশুনাগ-রাজবংশের একটা বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিপুল রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য হানাহানি অন্তর্ব্বিবাদ সহজ ও প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বংশের এক জন শক্তিশালী ব্যক্তি রাজাকে বিতাড়িত করিয়া নিজের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ইহার কিছুকাল পরে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন—এইভাবে ধারাবাহিক শাসন-পারম্পর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রজারাও সুখে ছিল না। তাহারা মাঝে মাঝে মাৎস্যন্যায় করিয়া রাজাকে মারিয়া আর একজনকে তাহার স্থানে বসাইয়া দিত। সেকালে প্রকৃতিপুঞ্জের সহিষ্ণুতা আধুনিক কালের মত এমন সর্ব্বংসহা হইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রয়োজন হইলে ধৈর্য্যের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইত। তখন শ্রীমন্মহারাজের শোণিতে পথের ধূলি নিবারিত হইত,—তাঁহার জঠর-নিষ্কাশিত অন্ত্র দ্বারা রাজপুরী পরিবেষ্টিত করিয়া জিঘাংসু বিদ্রোহীর দল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিত।

সে যাক। পুরাণে শিশুনাগবংশীয় মহারাজ চণ্ডের নাম পাওয়া যায় না। চণ্ডের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। মহিষের মত আকৃতির মধ্যে রাক্ষসের মত প্রকৃতি লইয়া ইনি কয়েক বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তার পর—কিন্তু সে পরের কথা।

রাজ-অবরোধে এক দাসী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিল। অবশ্য মহারাজ চণ্ডই কন্যার পিতা; সুতরাং সভাপণ্ডিত নবজাতা কন্যার কোষ্ঠী তৈয়ার করিলেন।

কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিত বলিলেন,—"শ্রীমন্, এই কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা। ইহাকে বর্জ্জন করুন।"

সিংহাসনে আসীন মহারাজের বঙ্কুর ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা দিল; পণ্ডিত কম্পিত হইলেন। স্পষ্ট কথা মহারাজ ভালবাসেন না; স্পষ্ট কথা বলিয়া অদ্যই সচিব শিবমিশ্রের যে দশা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানে। পণ্ডিত স্খলিত বচনে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্যই বলিতেছি, এ কন্যা বর্জ্জনীয়া।"

কিন্তু মহারাজের ভ্রূকুটি শিথিল হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কোন্ প্রিয়জনের অধিক অনিষ্ট হওয়া সম্ভব ?"

পণ্ডিত পুনরায় কোষ্ঠী দেখিলেন, তারপর ভয়ে ভয়ে বলিলেন,— "উপস্থিত পিতা-মাতা সকলেরই অনিষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মঙ্গল সপ্তমে ও শনি অষ্টমে থাকিয়া পিতৃস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে।"

কে কোথায় দৃষ্টি করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহল মহারাজের ছিল না। তাঁহার মুখে স্ফুরিত-বিদ্যুৎ বৈশাখী মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মহারাজের সাম্যদৃষ্টির সম্মুখে অপরাধী ও নিরপরাধের প্রভেদ নাই— অশুভ বা অপ্রীতিকর কথা যে উচ্চারণ করে সেই দণ্ডার্হ। এ ক্ষেত্রে শনি-মঙ্গলের পাপদৃষ্টির ফল যে জ্যোতিষাচার্য্যের শিরে বর্ষিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? পণ্ডিত প্রমাদ গণিলেন।

সভা-বিদূষক বটুক ভট্ট সিংহাসনের পাশে বসিয়াছিল। সে খর্ব্বকায় বামন, মস্তকটি বৃহদাকার, কণ্ঠস্বর এরূপ তীক্ষ্ণ যে, মনে হয় কর্ণের পটহ ভেদ করিয়া যাইবে। পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখিয়া সে সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"বিষকন্যা! তবে ত ভালই হইয়াছে, মহারাজ! এই দাসীপুত্রীকে সযত্নে পালন করুন। কালে যৌবনবতী হইলে ইহাকে

নগর-নটির পদে অভিষিক্ত করিবেন। আপনার তুষ্ট প্রজারা অচিরাৎ যম-মন্দিরে প্রস্থান করিবে।"

বটুক ভট্টকে রাজ-পার্ষদ সকলেই ভালবাসিত, শুধু তাহার বিদূষণ-চাতুর্য্যের জন্য নয়, বহুবার বহু বিপন্ন সভাসদ্‌কে সে রাজরোষ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

তাহার কথায় মহারাজের ভ্রূগ্রন্থি ঈষৎ উন্মোচিত হইল, তিনি বামহস্তে বটুকের কেশমুষ্টি ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন। সূত্রাগ্রে ব্যাদিত-মুখ মৎস্যের ন্যায় বটুক ঝুলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"বটুক, তোর জিহ্বা উৎপাটিত করিব।"

বটুক তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। রাজা হাস্য করিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইলেন। পণ্ডিতের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

ভৃঙ্গারে মাধ্বী ছিল। রাজার কটাক্ষমাত্রে কিঙ্করী চষক ভরিয়া তাঁহার হস্তে দিল। চষক নিঃশেষ করিয়া রাজা বলিলেন,—"এখন এই বিষকন্যাটাকে লইয়া কি করা যায়?"

গণদেব নামক একজন চাটুকার পার্ষদ বলিল,—"মহারাজ উহাকেও শিবমিশ্রের পথে প্রেরণ করুন—রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হোক।"

মহারাজ চণ্ডের রক্ত-নেত্রে একটা ক্রূর কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি স্বভাবস্ফীত অধর প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাসচিব শিবমিশ্র মহাশয় এখন কি করিতেছেন, কেহ বলিতে পার?"

গণদেব মুণ্ড আন্দোলিত করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে বলিল—"এইমাত্র দেখিয়া আসিতেছি, তিনি শ্মশানভূমিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া শ্মশান-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণভোজন করাইব বলিয়া কিছু মোদক লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নাই।" বলিয়া নিজ রসিকতায় অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে তাকাইল।

মহারাজ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ভাল। অদ্য নিশাকালে শিবাদল আসিয়া শিবমিশ্রের মুণ্ড ভক্ষণ করিবে।" তার পর ভীষণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"শিবমিশ্র আমার আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাই আজ তাহাকে শৃগালে ছিঁড়িয়া খাইবে।—তোমরা এ কথা স্মরণ রাখিও।"

সভা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহসী হইল না।

রাজা তখন সভা-জ্যোতিষীকে বলিলেন,—"পণ্ডিতরাজ, আপনার অভিমত রাজ্যের কল্যাণে এ কন্যা বর্জ্জিত হোক। ভাল, তাহাই হইবে। কন্যা ও কন্যার মাতা উভয়েই অদ্য রাত্রিতে শ্মশানে প্রেরিত হইবে। সেখানে কন্যার মাতা স্বহস্তে কন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করিবে। তাহা হইলে দৈব আপদ দূর হইবে ত ?'

পণ্ডিত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, এরূপ কঠোরতা নিষ্প্রয়োজন। কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জ্জন করুন, কিন্তু কন্যার মাতা নিরপরাধিনী—তাহাকে—"

রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"নিরপরাধিনী ! সে এরূপ কন্যা প্রসব করে কেন ?—যাক, আপনার বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নাই, যাহা করিবার আমি স্বহস্তে করিব। বলিয়া মহারাজ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যাহার দুর্দ্দম দানবপ্রকৃতি মর্ত্ত্যলোকে কোনও বস্তুকে ভয় করিত না, দৈব আপদের আশঙ্কা তাহাকে এমনই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল যে, নিজ ঔরসজাত কন্যার প্রতি তাহার চিত্তে তিলমাত্র মমতার অবকাশ ছিল না।

পাটলিপুত্র নগরের চৌষট্টি দ্বার, তন্মধ্যে দশটি প্রধান ও প্রকাশ্য। বাকীগুলি অধিকাংশই গুপ্তপথ।

এই গুপ্তপথের একটি রাজপ্রাসাদসংলগ্ন ; রাজা বা রাজপরিবারস্থ যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দ্বারপথে নগর-প্রাকারের বাহিরে যাইতে পারিতেন। তাল-কাণ্ডের একটি শীর্ণ সেতু ছিল, তাহার সাহায্যে পরিখা-পার হইতে হইত। এই স্থানে গঙ্গাপ্রবাহের সহিত খনিত পরিখা মিলিত হইয়াছিল।

পরিখার পরপারে কিছু দূর যাইবার পর গঙ্গাতটে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান আরম্ভ হইয়াছে ;—যত দূর দৃষ্টি যায়, তরুগুল্মহীন ধুধু বালুকা। বালুকার উপর অগণিত লৌহশূল প্রোথিত রহিয়াছে ; শূলগাত্রে কোথাও অর্দ্ধপথে বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও শুষ্ক নরকঙ্কাল শূলমূলে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। চারিদিকে শত শত নরকপাল বিক্ষিপ্ত। দিবাভাগেই এই মহাশ্মশানের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর ; অপিচ, রাত্রিকালে নগরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেলে এই মনুষ্যহীন মৃত্যুবাসরে যে পিশাচ-পিশাচীর নৃত্য আরম্ভ হয়, তাহা কল্পনা করিয়াই পাটলিপুত্রের নাগরিকরা শিহরিয়া উঠিত। দণ্ডিত অপরাধী ভিন্ন রাত্রিকালে মহাশ্মশানে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—চণ্ডালরাও মহাশ্মশানের অনির্ব্বাণ চুল্লীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রতিগমন করিত।

সে রাত্রে আকাশে সপ্তমীর খণ্ড চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। অপরিস্ফুট আলোক শ্মশানের বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর যেন একটা শ্বেতাভ কুজ্ঝটিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। তটলেহী গঙ্গার ধূসর প্রবাহ চন্দ্রালোকে কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হইতেছিল। শ্মশান ও নদীর সন্ধিরেখার উপর দূরে অনির্ব্বাণ চুল্লীর আরক্ত অঙ্গার জ্বলিতেছিল।

প্রথম প্রহর রাত্রি—প্রাকাররুদ্ধ পাটলিপুত্রে এখনও নগরগুঞ্জন শান্ত হয় নাই ; কিন্তু শ্মশানে ইহারই মধ্যে যেন প্রেতলোকের অশরীরী উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষে কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হয়, সূক্ষ্মদেহ

পিশাচী-ডাকিনীরা চক্ষু-খদ্যোত জ্বালিয়া লুব্ধ লালায়িত রসনায় গলিত শবমাংস অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। আকাশে নিশাচর পক্ষীর পক্ষশব্দ যেন তাহাদেরই আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

এই সময়, যে দিকে রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার, সেই দিক হইতে এক নারী ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে যাইতেছিল। রমণীর এক হস্তে একটি লৌহখনিত্র, অন্য হস্তে বক্ষের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রপিণ্ড ধরিয়া আছে। ক্ষীণ চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে রমণীর আকৃতি ভাল দেখা যায় না; সে যে যুবতী ও এক সময় সুন্দরী ছিল, তাহা তাহার রক্তহীন মুখ ও শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া অনুমান করাও দুরূহ। অতি কষ্টে দুর্ভর দেহ ও লৌহখনিত্র বহন করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধার মত সে চলিয়াছে। রুক্ষ কেশজাল মুখে বক্ষে ও পৃষ্ঠে বিপর্য্যস্তভাবে পড়িয়া আছে। রমণী মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে, ত্রাস-বিমূঢ় চক্ষে পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার চলিতেছে।

শ্মশানের সীমান্তে পৌঁছিয়া সে জানু ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটি কাতর আর্ত্তস্বর বাহির হইল; সেই সঙ্গে বক্ষের বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতেও ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল।

কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর রমণী আবার উঠিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সে শ্মশানের বীভৎস দৃশ্যাবলীর মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একবার সে চক্ষু তুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে দীর্ঘ শূল প্রোথিত রহিয়াছে; শূলশীর্ষে বিকট ভঙ্গিমায় এক নরমূর্ত্তি বিদ্ধ হইয়া আছে, শূল-নিম্নে দুইটা শৃগাল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য ভক্ষের দিকে তাকাইয়া আছে। চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে।

রমণী চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিল না, কয়েক পদ গিয়া আবার বালুর উপর পড়িয়া গেল।

এবার দীর্ঘকাল পরে রমণী উঠিয়া বসিল। বোধ হয় সংজ্ঞা হারাইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। বক্ষের বস্ত্রপিণ্ড ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উন্মত্তের মত উঠিয়া খনিত্র দিয়া বালু খনন করিতে আরম্ভ করিল।

অল্পকালমধ্যে একটি নাতিগভীর গর্ত্ত হইল। তখন রমণী সেই বস্ত্রপিণ্ড তুলিয়া লইয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল—অমনই ক্ষীণ নির্জ্জীব ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রমণী দুই হাতে কান চাপিয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত্ত পূরণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। সহসা দুই বাহু বাড়াইয়া বস্ত্রকুণ্ডলী গর্ত্ত হইতে তুলিয়া লইয়া সজোরে নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। একটা ধাবমান শৃগাল তাহার অতি নিকট দিয়া তাহার দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া গেল, বাহ্য-চেতনাহীন রমণী তাহা লক্ষ্য করিল না।

অতঃপর মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্ত মৃগীর মত নারী আবার এক দিকে ছুটিতে লাগিল। তখন তাহার আর ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞান নাই – কোন্ দিকে ছুটিয়াছে তাহাও জানে না; শুধু পূর্ব্ববৎ এক হস্তে খনিত্র ধরিয়া আছে, আর অপর হস্তে সেই বস্ত্রাবৃত জীবনকণিকাটুকু বক্ষে আঁকড়িয়া আছে।

কিছু দূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, সম্মুখে দূরে গঙ্গার শ্যামরেখা বোধ করি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বল-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, যেন সহসা উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এমনই ভাবে সে হাসিয়া উঠিল। তারপর অসীমবলে অবসন্ন দেহ সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

মানব-মানবীর জীবনে এরূপ অবস্থা কখনও কখনও আসে—যখন তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য হাহাকার করিয়া ছুটিয়া যায়।

জাহ্নবীর শীতল বক্ষে পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই, মধ্যে মাত্র ছয় সাত দণ্ড বালুভূমির ব্যবধান, এই সময় রমণীর মুহ্যমান চেতনা পার্শ্বের দিকে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইল। শব্দটা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর—অর্দ্ধব্যক্ত তর্জ্জনের মত শুনাইল। রমণীর গতি এই শব্দে আপনিই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চন্দ্রালোকে শুভ্র বালুকার উপর একপাল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের লাঙ্গুল বহির্দ্দিকে প্রসারিত। ঐ শৃগালচক্রের মধ্যে হইতে মনুষ্যকণ্ঠের তর্জ্জন মাঝে মাঝে ফুঁসিয়া উঠিতেছে, অমনি শৃগালের দল পিছু হটিয়া যাইতেছে। আবার ধীরে ধীরে অলক্ষিতে তাহাদের চক্র সঙ্কুচিত হইতেছে।

রমণী যন্ত্রচালিতের মত কয়েক পদ সেই দিকে অগ্রসর হইল। শৃগালেরা একজন জীবন্ত মনুষ্যকে আসিতে দেখিয়া দংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। তখন মধ্যস্থিত বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইল।

মাটির উপর কেবল একটি দেহহীন মুণ্ড রহিয়াছে। মুণ্ডের দুই বিক্ষত গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে, চক্ষে উন্মত্ত দৃষ্টি। মুণ্ড রমণীর দিকেই তাকাইয়া আছে।

রমণী এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মুণ্ড তখন বিকৃত স্বরে বলিল,—"তুমি প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও, আমাকে উদ্ধার কর।"

মানুষের কণ্ঠস্বরে রমণীর সাহস ফিরিয়া আসিল। সে আরও কয়েক পদ নিকটে আসিল; রুদ্ধ শুষ্ক কণ্ঠ হইতে অতি কষ্টে শব্দ বাহির করিল,—"কে তুমি?"

মুণ্ড বলিল—"আমি মানুষ, ভয় নাই। আমার দেহ মাটিতে প্রোথিত আছে—উদ্ধার কর।"

রমণী তখন কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিল, দেখিয়া সংহত অস্ফুট স্বরে বলিল—"মন্ত্রী শিবমিশ্র!"—তার পর খনিত্র দিয়া প্রাণপণে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া শিবমিশ্র কিয়ৎকাল মৃতবৎ মাটিতে শুইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে দুই হস্তে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমণীর ক্ষীণ অবসন্ন দেহ তখন ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

শিবমিশ্রের শৃগালদ্রষ্ট গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, তিনি সন্তর্পণে তাহা মুছিলেন। রমণীর রক্তলেশহীন পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দুর্ভাগিনি, তুমি কোন্ অপরাধে রাত্রিকালে মহাশ্মশানে আসিয়াছ?"

রমণী নীরবে পার্শ্বস্থ বস্ত্রপিণ্ড দেখাইয়া দিল, শিবমিশ্র দেখিলেন,—একটি শিশু। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পরিচয় কি? তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তোমার নাম স্মরণ করিয়া রাখিতে চাহি।"

রমণী নির্জীব কণ্ঠে বলিল,—"আমার নাম মোরিকা—আমি রাজপুরীর দাসী।"

শিবমিশ্র সচকিত হইলেন, বলিলেন,—"বুঝিয়াছি। তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করিলে?"

"আজ প্রভাতে!"

শিবমিশ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন।

"হতভাগিনি! কিন্তু তুমি শ্মশানে প্রেরিত হইলে কেন? পরম ভট্টারকের সন্তান গর্ভে ধারণ করা কি এতই অপরাধ?"

মোরিকা বলিল, "সভাপতি গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আমার কন্যা রাজ্যের অনিষ্টকারিণী বিষকন্যা—তাই—"

"বিষকন্যা!" শিবমিশ্রের চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল—"বিষকন্যা! দেখি!"

শিবমিশ্র ব্যগ্রহস্তে শিশুকে তুলিয়া লইলেন। তখন চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, ভাল দেখিতে পাইলেন না। তিনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চুল্লীর দিকে দ্রুতপদে চলিলেন।

চুল্লীর অঙ্গারের উপর ভস্মের প্রচ্ছদ পড়িয়াছে। শিবমিশ্র একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন—অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

তখন সেই শ্মশান-চুল্লীর আলোকে শিবমিশ্র নবজাত কন্যার দেহলক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার রক্তলিপ্ত মুখে এক পৈশাচিক হাস্য দেখা দিল।

তিনি মোরিকার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন,—"হাঁ, বিষকন্যা বটে।"

মোরিকা পূর্ব্ববৎ ভূশয্যায় পড়িয়া ছিল, প্রত্যুত্তরে একবার গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র আগ্রহকম্পিত স্বরে বলিলেন,—"বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, আমি উহাকে পালন করি। কেহ জানিবে না।"

মোরিকা পুনরায় অতি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র বলিলেন,—"তুমি ফিরিয়া গিয়া বলিও কন্যাকে বিনষ্ট করিয়াছ। আমি অদ্যই উহাকে লইয়া গঙ্গার পরপারে লিচ্ছবিদেশে পলায়ন করিব। তার পর—"

মোরিকা উত্তর দিল না। তখন শিবমিশ্র নতজানু হইয়া তাহার মুখ দেখিলেন। তার পর করাগ্রে শীর্ণ মণিবন্ধ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন।

ক্ষণেক পরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই হস্তে শিশুকে বুকে

চাপিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত চোখে দূরে অর্দ্ধদৃষ্ট রাজপ্রাসাদশীর্ষের দিকে চাহিলেন। কহিলেন,—"এই ভাল।"

এই সময় আকাশের নিকষে অগ্নির রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা রাজপুরীর ঊর্দ্ধে পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল, তার পর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সেই আলোকে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া শিবমিশ্র বলিলেন—"এ নিয়তির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখিলাম—উল্কা!"

তার পর মগ্নচন্দ্রা রাত্রির অন্ধকারে জাহ্নবীর তীররেখা ধরিয়া শিবমিশ্র পাটলিপুত্রের বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

মোরিকার প্রাণহীন শব মহাশ্মশানে পড়িয়া রহিল। যে শিবাকুল তাহার আগমনে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

২

অতঃপর ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

কালপুরুষের পলকপাতে শতাব্দী অতীত হয়; কিন্তু ক্ষুদ্রায়ু মানুষের জীবনে ষোল বৎসর অকিঞ্চিৎকর নয়।

মগধে এই সময়ের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়-বর্ণিত ঘটনার পর পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ ত্রয়োদশ বর্ষ মহারাজ চণ্ডের দোর্দ্দণ্ড শাসন সহ্য করিয়াছিল; তাহার পর একদিন তাহারা সদলবলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তখন তাহারা বিবেচনা করিয়া কাজ করে না—এ ক্ষেত্রেও তাহারা বিবেচনা করিল না। ক্রোধান্ধ মৌমাছির পাল যদি একটা মহিষকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দৃশ্যটা যেরূপ হয়, এই মাৎস্যন্যায়ের ব্যাপারটাও প্রায় তদ্রূপ হইল।

গর্জ্জমান চণ্ডকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া বিদ্রোহ-নায়কেরা প্রথমে তাহার মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত কাটিয়া ফেলিল। মহারাজ চণ্ডকে এক কোপে শেষ করিয়া ফেলিলে চলিবে না,—অন্য বিবেচনা না থাকিলেও এ বিবেচনা বিদ্রোহীদের ছিল। মহারাজ এত দিন ধরিয়া যাহা অগণিত প্রজাপুঞ্জকে দুই হস্তে বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই তাহারা প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছে। এই প্রত্যর্পণক্রিয়া এক মুহূর্ত্তে হয় না।

অতঃপর চণ্ডের পদদ্বয় জঙ্ঘাগ্রন্থি হইতে কাটিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রতিহিংসাপিপাসু জনতার তৃপ্তি হইল না। এ ভাবে চলিলে বড় শীঘ্র মৃত্যু উপস্থিত হইবে—তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। মৃত্যু ত নিষ্কৃতি। সুতরাং জননায়করা মহারাজের বিখণ্ডিত রক্তাপ্লুত দেহ ঘিরিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিল। হিংসা-পরিচালিত জনতা চিরদিনই নিষ্ঠুর, সে কালে বুঝি তাহাদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না।

একজন নাসিকাহীন শৌণ্ডিক উত্তম পরামর্শ দিল। চণ্ডকে হত্যা করিয়া কাজ নাই, বরঞ্চ তাহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টাই করা হউক। তার পর এই অবস্থায় তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য সর্ব্বজনগম্য স্থানে বাঁধিয়া রাখা হউক। নাগরিকরা প্রত্যহ ইহাকে দেখিবে, ইহার গাত্রে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিবে। চণ্ডের এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভবিষ্যৎ রাজারাও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

সকলে মহোল্লাসে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতেও বিলম্ব হইল না।

তার পর মগধবাসীর রক্ত কথঞ্চিৎ কবোষ্ণ হইলে তাহারা নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বসিল। শিশুনাগবংশেরই দূর-সম্পর্কিত সৌম্যকান্তি এক যুবা—নাম সেনজিৎ—মৃগয়া পক্ষিপালন ও সুরা আস্বাদন করিয়া সুখে ও তৃপ্তিতে কালযাপন করিতেছিল, রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল

না—সকলে তাহাকে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল। সেনজিৎ অতিশয় নিরহঙ্কার সরলচিত্ত ও ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় যুবা; নারীজাতি ভিন্ন জগতে তাহার শত্রু ছিল না; তাই নাগরিকগণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সেনজিৎ প্রথমটা রাজা হইতে আপত্তি করিল; কিন্তু তাহার বন্ধুমণ্ডলীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক সিংহাসনে গিয়া বসিল। একজন ভীমকান্তি কৃষ্ণকায় নাগরিক স্বহস্তে নিজ অঙ্গুলি কাটিয়া তাহার ললাটে রক্ত-তিলক পরাইয়া দিল।

সেনজিৎ করুণবচনে বলিল—"যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিব, কিন্তু আমাকে রাজ্য শাসন বা বংশরক্ষা করিতে বলিও না।"

তাহাই হইল। কয়েকজন বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন; মহারাজ সেনজিৎ পূর্ব্ববৎ মৃগয়াদির চর্চ্চা করিয়া ও বটুক ভট্টের সহিত রসালাপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। নানা কারণে কাশী কোশল লিচ্ছবি তখন যুদ্ধ করিতে উৎসুক ছিল না; ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে একটা মৌখিক মৈত্রী দেখা যাইতেছিল,—তাই মহারাজকে বর্ম্ম-চর্ম্ম পরিধান করিয়া শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে হইল না। ওদিকে রাজ-অবরোধও শূন্য পড়িয়া রহিল। কঞ্চুকী মহাশয় ছাড়া রাজ্যে আর কাহারও মনে খেদ রহিল না।

মগধের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালী-তেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু ঘটিতেছিল। মহামনীষী কৌটিল্য তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির অভাব ছিল না। বৈশালীতে বাহ্য মিত্রতার অন্তরালে গোপনে গোপনে মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

শিবমিশ্র বৈশালীতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিদেশে

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা নাই। রাজার পরিবর্তে নির্বাচিত নায়কগণ রাজ্য শাসন করেন। শিবমিশ্রের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সসম্মানে মন্ত্রণাদাতা সচিবের পদ প্রদান করিলেন।

কেবল শিবমিশ্রের নামটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার গণ্ডের শৃগালদংশনক্ষত শুকাইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষত শুকাইলে দাগ থাকিয়া যায়। তাঁহার মুখখানা শৃগালের মত হইয়া গিয়াছিল। জনসাধারণ তাঁহাকে শিবামিশ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শিবমিশ্র তিক্ত হাসিলেন, কিন্তু আপত্তি করিলেন না। শৃগালের সহিত তুলনায় যে ধূর্ত্ততার ইঙ্গিত আছে, তাহা তাঁহার অরুচিকর হইল না। ঐ নামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

দিনে দিনে বৈশালীতে শিবামিশ্রের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার গৃহে সেই শ্মশানলব্ধ অগ্নিকণা সাগ্নিকের যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চণ্ড ও মোরিকার কন্যা উল্কাকে একমাত্র অগ্নির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যতই তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, জ্বলন্ত বহ্নির মত রূপের সঙ্গে সঙ্গে ততই তাহার দুর্জ্জয় দুর্ব্বশ প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল। শিবামিশ্র তাহাকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতির উগ্রতা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—'শিশু-নাগবংশের এই বিষকণ্টক দিয়াই শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদ করিব।'

তীক্ষ্ণ-মেধাবিনী উল্কা চতুঃষষ্ঠী কলা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা, অসিবিদ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত অবলীলাক্রমে শিখিয়া ফেলিল। কেবল নিজ উদ্দাম প্রকৃতি সংহত করিতে শিখিল না।

মগধের প্রজাবিদ্রোহের সংবাদ যে দিন বৈশালীতে পৌঁছিল, সে দিন শিবামিশ্র গূঢ় হাস্য করিলেন। এই বিদ্রোহে তাঁহার কতখানি হাত ছিল,

কেহ জানিত না। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন আবার সংবাদ আসিল যে, শিশুনাগবংশেরই আর একজন যুবা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। এই শিশুনাগবংশ যেন সর্পবংশেরই মত—কিছুতেই নিঃশেষ হইতে চায় না।

তার পর আরও কয়েক বৎসর কাটিল; শিবামিশ্র উল্কার দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে দিন উল্কার বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই দিন শিবামিশ্র তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎসে, তুমি আমার কন্যা নহ। তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে চাহি, উপবেশন কর।"

ভাবলেশহীন কণ্ঠে শিবামিশ্র বলিতে লাগিলেন, উল্কা করলগ্ন-কপোলে বসিয়া সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিল; তাহার স্থির চক্ষু নিমেষের জন্য শিবামিশ্রের মুখ হইতে নড়িল না। কাহিনী সমাপ্ত করিয়া শিবামিশ্র বলিলেন—"প্রতিহিংসাসাধনের জন্য তোমায় ষোড়শ বর্ষ পালন করিয়াছি। চণ্ড নাই, কিন্তু শিশুনাগবংশ অদ্যাপি সদর্পে বিরাজ করিতেছে। সময় উপস্থিত—তোমার মাতা মোরিকা ও পালক পিতা শিবামিশ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।"

"কি করিতে হইবে?"

"শিশুনাগবংশকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।"

"পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।"

"শুন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি বিষকন্যা; তোমার উগ্র অলোকসামান্য রূপ তাহার নিদর্শন। পুরুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, পতঙ্গ যেমন অগ্নি-শিখার দিকে আকৃষ্ট হয়। তুমি যে পুরুষের কণ্ঠলগ্না হইবে তাহাকেই মরিতে হইবে। এখন তোমার কর্ত্তব্য বুঝিয়াছ? মগধের সহিত বর্ত্তমানে লিচ্ছবি-দেশের মিত্রভাব চলিতেছে, এ সময়ে অকারণে যুদ্ধঘোষণা করিলে রাষ্ট্রীয়

ধনক্ষয় জনক্ষয় হইবে, বিশেষতঃ যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। মগধবাসীরা নূতন রাজার শাসনে সুখে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আছে—রাজ্যে অসন্তোষ নাই। এরূপ সময় রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ বাধানো সমীচীন নয়। কিন্তু শিশু-নাগ-বংশকে মগধ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তাই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বর্ত্তমান রাজা সেনজিৎ ব্যসনপ্রিয় যুবা, শুনিয়াছি রাজকার্য্যে তাহার মতি নাই;—সর্ব্বপ্রথম তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে।—পারিবে?"

উল্কা হাসিল। যাবক-রক্ত অধরে দশনদ্যুতি সৌদামিনীর মত ঝলসিয়া উঠিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া শিবামিশ্রের মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

তিনি বলিলেন,—"এখন সভায় কি স্থির হইয়াছে, বলিতেছি। মগধে কিছু দিন যাবৎ বৈশালীর প্রতিভূ কেহ নাই, কিন্তু মিত্ররাজ্যে প্রতিনিধি থাকাই বিধি, না থাকিলে সৌহার্দ্দের অভাব সূচনা করে। এ জন্য সঙ্কল্প হইয়াছে, তুমি লিচ্ছবি-রাষ্ট্রের প্রতিভূস্বরূপ পাটলিপুত্রে গিয়া বাস করিবে। প্রতিভূকে সর্ব্বদা রাজ-সন্নিধানে যাইতে হয়, সুতরাং রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাতে কোনও বাধা থাকিবে না। অতঃপর তোমার সুযোগ!"

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"ভাল। কিন্তু আমি নারী, এজন্য কোনও বাধা হইবে না?"

শিবামিশ্র বলিলেন—"বৃজির গণরাজ্যে নারী-পুরুষে প্রভেদ নাই, সকলের কক্ষা সমান।"

"কবে যাইতে হইবে?"

"আগামীকল্য তোমার যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে! তোমার সঙ্গে দশ জন পুরুষ পার্শ্বচর থাকিবে, এতদ্ব্যতীত সখী পরিচারিকা তোমার অভিরুচিমত লইতে পার।"

উল্কা শিবামিশ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অকম্পিত স্বরে বলিল—"পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত লইয়া আমি জন্মিয়াছি, তাহা আমার জননীর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ লইয়া সার্থক হইবে। আপনি যে আমাকে কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়া প্রতিশোধ করিব।"

শিবামিশ্রের কণ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কন্যা, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, লব্ধকামা লইয়া আমার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন কর। দধীচির মত তোমার কীর্ত্তি পুরাণে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।"

* * * *

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজার মৃগয়া-কানন। উল্কা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, এই বহু যোজনব্যাপী অটবীর ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে চলিয়াছিল। তাহার সঙ্গী কেহ ছিল না, সঙ্গী সহচরদিগকে সে রাজপথ দিয়া প্রেরণ করিয়া দিয়া একাকী বনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, পুরুষ রক্ষীরা ইহাতে সসম্ভ্রমে ঈষৎ আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু উল্কা তীব্র অধীর স্বরে নিজ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিল—"আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। তোমরা নগরতোরণে পৌঁছিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। আমি একাকী চিন্তা করিতে চাই।"

স্থির অচপল দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া উল্কা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ছিল, অশ্বও তাড়নার অভাবে ময়ূরসঞ্চারী গতিতে চলিয়াছিল; পাছে আরোহিণীর চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া যায় এই ভয়ে যেন গতিচ্ছন্দ অটুট রাখিয়া চলিতেছিল! শষ্পের উপর অশ্বের খুরধ্বনিও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ছায়া-চিত্রিত বনের ভিতর দিয়া কৃষ্ণ বাহনের পৃষ্ঠে যেন সঞ্চারিণী আলোকলতা চলিয়াছে—বনের ছায়ান্ধকার ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিতেছে। উল্কার বক্ষে লৌহজালিক, পার্শ্বে তরবারি, কটিতে ছুরিকা, পৃষ্ঠে সংসর্পিত কৃষ্ণ বেণী; কর্ণে মাণিক্যের অবতংস অঙ্গারবৎ জ্বলিতেছে। এই অপূর্ব্ব বেশে উল্কার রূপ যেন আরও উন্মাদকর হইয়া উঠিয়াছে।

কাননপথ অর্দ্ধেক অতিক্রান্ত হইবার পর সহসা পশ্চাতে দ্রুত-অস্পষ্ট অশ্বখুরধ্বনি শুনিয়া উল্কার চমক ভাঙ্গিল। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল, এক জন শূলধারী অশ্বারোহী সবেগে অশ্ব চালাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে; তাহার কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, পরিধানে শবরের বেশ। উল্কাকে ফিরিতে দেখিয়া সে ভল্ল উত্তোলন করিয়া সগর্জ্জনে হাঁকিল—"দাঁড়াও।"

উল্কা দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহী তাহার পার্শ্বে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল—"কে তুই?—রাজার মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া বিনা অনুমতিতে চলিয়াছিস্? তোর কি প্রাণের ভয় নাই?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুরুষ সবিস্ময়ে থামিয়া গিয়া বলিল—"এ কি! এ যে নারী!"

উল্কা অধরোষ্ঠ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া বলিল—"নারীই বটে! তুমি কে?"

পুরুষ ভল্ল নামাইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চোখে লালসার তীক্ষ্ণ আলোক দেখা দিল। সে কণ্ঠস্বর মধুর করিয়া বলিল—"আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, এই পথহীন বনে একাকিনী চলিয়াছ, তোমার কি দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার ভয় নাই?"

উল্কা উত্তর দিল না; বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বকে পুনর্ব্বার সম্মুখদিকে চালিত করিল।

রক্ষী সনির্ব্বন্ধ স্বরে বলিল—"তুমি কি পাটলিপুত্র যাইবে? চল, আমি তোমাকে কানন পার করিয়া দিয়া আসি!" বলিয়া সে নিজ অশ্ব চালিত করিল।

উল্কা এবারও উত্তর দিল না, অবজ্ঞাস্ফুরিত-নেত্রে একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। কিন্তু রক্ষী কেবল নেত্রাঘাতে প্রতিহত হইবার পাত্র নয়, সে লুব্ধ নয়নে উল্কার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে দেখিতে তাহার পাশে পাশে চলিল।

ক্রমে দুই অশ্বের ব্যবধান কমিয়া আসিতে লাগিল। উল্কা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

রক্ষী আবার মধু-ঢালা সুরে বলিল,—"সুন্দরি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার এরূপ কন্দর্প-বিজয়ী বেশ কেন?"

উল্কা বিরস-স্বরে বলিল—"সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই।"

রক্ষী অধর দংশন করিল; এ নারী যেমন রূপসী, তেমনই মদ-গর্ব্বিতা! ভাল, তাহার মদগর্ব্ব লাঘব করিতে হইবে; এ বনের অধীশ্বর কে তাহা জানাইয়া দিতে হইবে।

রক্ষী আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক উল্কার হাত ধরিল। উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সর্প-তর্জ্জনের মত শীৎকার করিয়া বলিল,—"আমাকে স্পর্শ করিও না—অনার্য্য!

রক্ষীর মুখ আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সম্পূর্ণ অনার্য্য না হইলেও সে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণজাত অম্বষ্ঠ বটে, তাই এই হীনতা-জ্ঞাপক সম্বোধন তাহাকে অঙ্কুশের মত বিদ্ধ করিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"অনার্য্য! ভাল, আজ এই অনার্য্যের হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি"—বলিয়া বাহু দ্বারা কটি বেষ্টন করিয়া উল্কাকে আকর্ষণ করিল।

উল্কার মুখে বিষ-তীক্ষ্ণ হাসি ক্ষণেকের জন্য দেখা দিল।

"আমি বিষকন্যা—আমাকে স্পর্শ করিলে মরিতে হয়। বলিয়া সে

রক্ষীর পঞ্জরে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, তার পর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

পাটলিপুত্রের দুর্গতোরণে যখন উল্কা পৌঁছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। শান্তির সময় দিবাভাগে তোরণে প্রহরী থাকে না, নাগরিকগণও মধ্যাহ্নের খররৌদ্রতাপে স্ব স্ব গৃহচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছে; তাই তোরণ জনশূন্য। কেবল উল্কার পথশ্রান্ত সহচরগণ উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

উল্কা উন্নত তোরণ-সম্মুখে ক্ষণেক দাঁড়াইল। একবার উত্তরে দূর-প্রসারিত শূলকণ্টকিত শ্মশানভূমির দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তার পর নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে তোরণ-প্রবেশ করিল।

কিন্তু তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক পদ যাইতে না যাইতে আবার তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সহসা পার্শ্ব হইতে বিকৃতকণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জল! জল! জল দাও!"

রুক্ষ উগ্রকণ্ঠের এই প্রার্থনা কানে যাইতেই উল্কা অশ্বের মুখ ফিরাইল। দেখিল, তোরণপার্শ্বস্থ প্রাচীরগাত্র হইতে লৌহবলয়-সংলগ্ন স্থূল শৃঙ্খল ঝুলিতেছে, শৃঙ্খলের প্রান্ত এক নরাকার বীভৎস মূর্ত্তির কটিতে আবদ্ধ। মূর্ত্তির করপত্র নাই, পদদ্বয়ও জঙ্ঘাসন্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন—জটাবদ্ধ দীর্ঘ কেশে মুখ প্রায় আবৃত। সে তপ্ত পাষাণ-চত্বরের উপর কৃষ্ণকায় কুম্ভীরের মত পড়িয়া আছে এবং লেলিহ রসনায় অদূরস্থ জলকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—"জল! জল!" মাধ্যন্দিন সূর্য্যতাপে তাহার রোমশ দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া চত্বর সিক্ত করিয়া দিতেছে।

উল্কা উদাসীনভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মনে করুণার উদ্রেক হইল না। শুধু সে মনে মনে ভাবিল—এই মগধবাসীরা দেখিতেছি নিষ্ঠুরতায় অতিশয় নিপুণ।

শৃঙ্খলিত ব্যক্তি জন-সমাগম দেখিয়া জানুতে ভর দিয়া উঠিল, রক্তিম চক্ষে চাহিয়া বন্য জন্তুর মত গর্জ্জন করিল—"জল! জল দাও!"

উল্কা এক সহচরকে ইঙ্গিত করিল; সে জলকুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল। শৃঙ্খলিত ব্যক্তি উত্তপ্ত মরুভূমির মত জল শুষিয়া লইল। তার পর তৃষ্ণা নিবারিত হইলে অবশিষ্ট জল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া লইল।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ অপরাধে তোমার এরূপ দণ্ড হইয়াছে?"

গত তিন বৎসর ধরিয়া বন্দী প্রতিনিয়ত বিদ্রূপকারী নাগরিকদের নিকট এই একই প্রশ্ন শুনিয়া আসিতেছে। সে উত্তর দিল না—হিংস্রদৃষ্টিতে উল্কার দিকে তাকাইয়া পিছু ফিরিয়া বসিল।

উল্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমার এরূপ অবস্থা করিয়াছে? শিশুনাগবংশের রাজা?"

শ্বাপদের মত তীক্ষ্ণ দন্ত বাহির করিয়া বন্দী ফিরিয়া চাহিল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, একবার মুক্তি পাইলে সে উল্কাকে দুই বাহুতে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে। উল্কা যে তাহাকে এইমাত্র পিপাসার পানীয় দিয়াছে, সে জন্য তাহার কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই।

সে বিকৃত মুখে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল—"পথের কুকুর সব, দূর হইয়া যা। লজ্জা নাই? একদিন আমি তোদের পদতলে পিষ্ট করিয়াছি, আবার যে দিন এই শৃঙ্খল ছিঁড়িব, সে দিন আবার পদদলিত করিব। এখন পলায়ন কর—আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

উল্কার চোখের দৃষ্টি সহসা তীব্র হইয়া উঠিল; সে অশ্বপৃষ্ঠে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি? তোমার নাম কি?"

ক্ষিপ্তপ্রায় বন্দী দুই বাহু দ্বারা নিজ বক্ষে আঘাত করিতে করিতে বলিল,—"কে আমি? কে আমি? তুই জানিস্ না? মিথ্যাবাদিনি, আমাকে কে না জানে? আমি চণ্ড—আমি মহারাজ চণ্ড! তোর

প্রভু। তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর! বুঝিলি? আমি মগধের ন্যায্য অধিপতি মহারাজ চণ্ড।

উল্কা ক্ষণকালের জন্য যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। তার পর তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, নাসা স্ফুরিত হইতে লাগিল। তাহার এই পরিবর্ত্তন বন্দীরও লক্ষ্যগোচর হইল, উন্মত্ত প্রলাপ বকিতে বকিতে সে সহসা থামিয়া গিয়া নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উল্কা কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া সহচরদের দিকে ফিরিল, ধীরস্বরে কহিল—"তোমরা ঐ পিপ্পলীবৃক্ষতলে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর, আমি এখনই যাইতেছি।"

সহচরগণ প্রস্থান করিল।

তখন উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীর সম্মুখীন হইল। চত্বরের উপর উঠিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে বন্দীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল, —"তুমিই ভূতপূর্ব্ব রাজা চণ্ড।"

চণ্ড সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—"ভূতপূর্ব্ব নয়—আমিই রাজা। আমি যত দিন আছি, তত দিন মগধে অন্য রাজা নাই।"

"তোমাকে তবে প্রজারা হত্যা করে নাই?"

"আমাকে হত্যা করিতে পারে, এত শক্তি কাহার?"

রক্তহীন অধরে উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নাম্নী জনৈকা দাসীর কথা মনে পড়ে?"

চণ্ডের জীবনে বহুশত মোরিকা ক্রীড়াপুত্তলীর মত যাতায়াত করিয়াছে, দাসী মোরিকার কথা তাহার মনে পড়িল না।

উল্কা তখন জিজ্ঞাসা করিল—"মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মিয়াছিল, মনে পড়ে?"

এবার চণ্ডের চক্ষুতে স্মৃতির আলো ফুটিল, সে হিংস্রহাস্যে দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—"মনে পড়ে, সেই বিষকন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করাইয়াছিলাম। শিবমিশ্রকেও শ্মশানের শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছিল।" অতীত নৃশংসতার স্মৃতির মধ্যেই এখন চণ্ডের একমাত্র আনন্দ ছিল।

উল্কা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—"সে বিষকন্যা মরে নাই, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ভক্ষণ করে নাই। মহারাজ, নিজের কন্যাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

চণ্ড চমকিত হইয়া মুণ্ড ফিরাইল।

উল্কা তাহার কাছে গিয়া কর্ণকুহরে বলিল—"আমিই সেই বিষকন্যা। মহারাজ, শিশুনাগবংশের চিরন্তন রীতি স্মরণ আছে কি? এ বংশের রক্ত যাহার দেহে আছে, সেই পিতৃহন্তা হইবে।—তাই বহুদূর হইতে বংশের প্রথা পালন করিতে আসিয়াছি।"

চণ্ড কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। উদ্যতফণা সর্প যেমন বিদ্যুদ্বেগে দংশন করে, তেমনই উল্কার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবেশ করিল। সে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধড়্ফড় করিতে লাগিল। দুইবার সে বাক্যনিঃসরণের চেষ্টা করিল কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—মুখ দিয়া গাঢ় রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। শেষে কয়েকবার পদপ্রক্ষেপ করিয়া চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

উল্কা কটিলগ্ন হস্তে দাঁড়াইয়া দেখিল। তার পর ধীরপদে গিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিল, আর পিছু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। নির্জ্জন তোরণপার্শ্বে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ষোল বৎসরের পুরাতন নাট্যের শেষ অঙ্কে যে দ্রুত অভিনয় হইয়া গেল, জনপূর্ণ পাটলিপুত্রের কেহ তাহা দেখিল না।

এইরূপে শোণিতপঙ্কে দুই হস্ত রঞ্জিত করিয়া মগধের বিষকন্যা আবার মগধের মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিল।

৩

মদন-মহোৎসবের পূর্ব্বেই এবার গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইয়াছে। বিজিগীষু নিদাঘের জয়পতাকা বহিয়া যেন অশোক, কিংশুক, কৃষ্ণচূড়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবু, কুসুম্ভ ও রঙ্গনের শোণিমা প্রত্যাসন্ন বসন্তোৎসবের বর্ণ-বিলাস বক্ষে ধারণ করিয়া উৎসুক নাগরিকাদিগকে যেন জানাইতেছে—"ভয় নাই!" 'মাধবের অরুণ নেত্র দেখিয়া শঙ্কা করিও না, এখনও মধুমাস শেষ হয় নাই।' তাহাদের সমর্থন করিয়াই যেন চূত-মুকুল-লোভী মদারুণিত-চক্ষু কোকিল বারম্বার কুহরিয়া উঠিতেছে—'কুহকের কাল সমাগত, কুহকিনীরাও প্রস্তুত হও।'

মগধের রাজপ্রাসাদেও এই নব-বসন্তজাত মদালসতা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রধান তোরণের প্রতীহার-ভূমিতে লৌহ-শিরস্ত্রাণ পরিহিত শূলহস্ত দ্বারী উন্মনভাবে এক প্রফুল্ল কর্ণিকার-বৃক্ষের পানে তাকাইয়া ছিল; বোধ করি, নির্জ্জন কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরে ঐ বৃক্ষের দিকে চাহিয়া কোনও তপ্তকাঞ্চনবর্ণাযবনী প্রতীহারীর নীলাব্জ-নয়নের কথা ভাবিতেছিল। তোরণের অভ্যন্তরে ভবনে ভবনে নারী-সৈন্যের পাহারা। মহারাজের অবরোধে মহাদেবী নাই বটে, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ধনুষ্পাণি যবনী সেনা পূর্ব্ববৎ আছে। প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে মন্ত্রগৃহে, মল্লাগারে, কলাভবনে, কোষাগারে—সর্ব্বত্র দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের বক্ষে অতিপিনদ্ধ বর্ম্ম, হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে তূণীর। শ্রোণিভারমন্থর-গতিতে তাহারা দ্বারসম্মুখে পাদচারণ করিতেছে, কখনও অলস উৎসুক নেত্রে অলিন্দের বাহিরে সুদূর-দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। হয়ত তাহাদের মনেও দূরদূরান্তস্থিত জন্মভূমির দ্রাক্ষারস-মদির স্বপ্ন জাগিতেছে।

এই তন্দ্রালস ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে মন্ত্রগৃহের এক শীতলকক্ষে মহারাজ সেনজিৎ কয়েক জন বয়স্যের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। বিদূষক বটুক ভট্টও ছিল, নিরুৎসুকভাবে রাজা ও বিদূষকে অক্ষক্রীড়া চলিতেছিল। প্রতি দ্বারে ও বাতায়নে জলসিক্ত উশীরগুচ্ছ ঝুলিতেছে, বাহিরের আতপ্ত বায়ু তাহার স্পর্শে স্নিগ্ধ-সুগন্ধি হইয়া মহারাজের চন্দনপঙ্কচর্চিত দেহ অবলেহন করিতেছিল। একজন বয়স্য অদূরে বসিয়া সপ্তস্বরার তন্ত্রী হইতে অতি মৃদুভাবে বসন্তরাগের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কিয়ৎকাল ক্রীড়া চলিবার পর মহারাজের চঞ্চল চিত্ত আর অক্ষবাটে নিবদ্ধ থাকিতে চাহিল না; তিনি এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। বাদ্যরত বয়স্য বসন্তের সহিত পঞ্চম মিশাইয়া ফেলিতেছিল, রাজা তাহার ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিলেন। শেষে অক্ষ ফেলিয়া, পার্শ্বস্থিত কপিত্থ-সুরভিত তক্রের পাত্র নিঃশেষ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বসন্তোৎসবের আর বিলম্ব কত?"

বটুক ভট্টের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর পূর্ব্ববৎ আছে, শুধু মস্তকশীর্ষে গ্রন্থিধৃত কেশগুচ্ছ একটু পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অক্ষক্রীড়ায় জিতিতেছিল; মহারাজের পেশল দেহকান্তির দিকে এক ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—"মদনের সহিত যাহার মৌখিক পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, সে বসন্তোৎসবের সংবাদ জানিয়া কি করিবে? বিল্বফল পাকিলে কি না জানিয়া পরভৃতের কি লাভ?"

মহারাজ হাসিলেন। হাসিলে মহারাজকে বড় সুন্দর দেখাইত। তাঁহার তরুণ মুখের সদা-স্ফূর্ত্ত হাসিতে যেন অন্তরের নিরভিমান অনাড়ম্বর সরলতা প্রতিবিম্বিত হইত।

তিনি সকৌতুকে বলিলেন—"বটুক, আমাকে কাক বলিলে না কোকিল বলিলে?"

বটুক ভট্ট বলিল—“মহারাজের যেটা অভিরুচি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন।”

মহারাজ বলিলেন—“তবে কোকিলই স্বীকার করিলাম। কোকিল অতি গুণবান পক্ষী; দোষের মধ্যে সে কাকের নাড়ে ডিম্ব প্রসব করে।”

বটুক বলিল—“এ বিষয়ে মহারাজ অপেক্ষা কোকিল শ্রেষ্ঠ।”

স্মিতমুখে সেনজিৎ প্রশ্ন করিলেন—“কিসে?”

“কোকিল ত তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, মহারাজ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।”

মহারাজের মুখ ঈষৎ বিষণ্নভাব ধারণ করিল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—“দেখ বটুক, তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। নারীজাতিকে আমি বড় ভয় করি—এই জন্যই বসন্তোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। নারীজাতি এই সময় অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে।”

বটুক ভট্টও বিষণ্নভাবে শির নাড়িয়া বলিল—“সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিয়া পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান, বয়সেরও ইয়ত্তা নাই; কিন্তু কয়েক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, তিনি আমার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন।”

হাস্য গোপন করিয়া মহারাজ বলিলেন—“বড় ভয়ানক কথা বটুক, তবে আর তোমার গৃহে গিয়া কাজ নাই। আমার অন্তঃপুর শূন্য আছে, তুমি এইখানেই এ কয় দিন নিরাপদে যাপন কর। এ বয়সে গৃহিণীর কটাক্ষবাণ খাইলে আর প্রাণে বাঁচিবে না।”

বটুক ভট্টের মুখ অধিকতর বিষণ্ন হইল, সে বলিল—“তাহা হয় না,

মহারাজ। এই বসন্তকালে দেশশুদ্ধ কোকিল পরগৃহে ডিম্ব উৎপাদন করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখন গৃহত্যাগ করিলে আবার অন্য বিপদ আসিয়া পড়িবে।"

বয়স্যেরা সকৌতুকে উভয়ের রসোক্তি-বিনিময় শুনিতেছিল, বটুকের কথার ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন বয়স্য বলিল—মহারাজ, বটুক ভট্ট অকারণে আপনাকে নারীজাতি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। আমি অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, নারীজাতি—বিশেষতঃ সুন্দরী ও যৌবনবতী নারী—অবহেলার বস্তু নয়, পুরুষমাত্রেরই সাধন-যোগ্যা। কণ্টকীফলের মত বাহিরে দুষ্প্রধর্ষা হইলেও অন্তরে তাহারা অতি কোমল ও সুস্বাদু।"

মহারাজ বলিলেন—"নারীজাতি তাহা হইলে কণ্টকীফলের সহিত তুলনীয়! ইহাই তোমার মত?"

"হাঁ মহারাজ। একমাত্র ভোক্তাই এই ফলের রসজ্ঞ, দূর হইতে যে ব্যক্তি কেবল নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহার কাছে ইহার রস অব্যক্ত।"

"বটুক, তোমার কি অভিমত?"

বটুক গম্ভীরভাবে বলিল—"আমার অভিমত, নারীজাতি একমাত্র বিল্বফলের সহিত তুলনীয়। যে ক্ষৌরিত-চিকুর হতভাগ্য একবার বিল্বতলে গিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার যাইবে না।"

এইরূপ রঙ্গপরিহাসে কিছুকাল অতীত হইবার পর একজন বয়স্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, সত্য বলুন, স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কি জন্য? বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?"

মহারাজ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"রুচির অভাবই প্রধান কারণ। যদি এ কারণ যথেষ্ট মনে না কর, তবে বলিতে পারি, এই নারীজাতিই পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হন্তারক। ভাবিয়া দেখ শ্রীরামচন্দ্রের কথা, স্মরণ

কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। যে ব্যক্তি সুখের অভিলাষী, সে এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া নারীজাতিকে দূরে রাখিবে।"

বয়স্য বলিল—"কিন্তু মহারাজ—বংশধর?"

সেনজিৎ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ হইতে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হইল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"বংশধর! ভানুমিত্র, শিশুনাগ-বংশে বংশধরের কথা চিন্তা করিতে তোমার ভয় হয় না? শুনিয়াছি, শিশুনাগ-বংশে আর কেহ জীবিত নাই, আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গে যেন এই অভিশপ্ত বংশ লুপ্ত হয়।"

বয়স্য সকলে অধোমুখে নীরব রহিল; একটা প্রতিবাদ বাক্যও কাহারও মুখে যোগাইল না।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিল। তার পর সহসা এই কুণ্ঠিত নীরবতা ভেদ করিয়া মন্ত্রগৃহের প্রতীহার-ভূমিতে দ্রুতচ্ছন্দে পটহ বাজিয়া উঠিল।

বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া রাজা বলিলেন—"এ সময় পটহ কেন? বটুক, কে আসিল দেখ। বলিও, এখন আমি বিশ্রাম করিতেছি, কল্য প্রভাতে সভায় সাক্ষাৎ হইবে।"

মহারাজ সাধারণতঃ কোনও দর্শনপ্রার্থীকে ফিরাইতেন না, কিন্তু আজ উল্লিখিত আলোচনার পর তাঁহার মনের প্রসন্নতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বটুক ভট্ট প্রস্থান করিল। সেনজিৎ ঈষৎ কুঞ্চিত ললাটে বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বটুক ভট্ট সবেগে প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া একেবারে মহারাজের পদমূলে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন—"বটুক, কি হইল?"

বটুক উন্মুক্ত বক্তৃপথে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল,—"মহারাজ, জঙ্ঘাবল প্রদর্শন করিয়াছি!"

"তাহা ত দেখিতেছি। কিন্তু পলাইয়া আসিলে কেন? কে আসিয়াছে?"

"ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।

"সে কি। স্ত্রীলোক?"

"কদাচ নয়। উর্বশী হইলেও হইতে পারে, নচেৎ নিশ্চয় তিলোত্তমা। কিন্তু বক্ষে কঞ্চুলী নাই, তৎপরিবর্ত্তে লৌহজালিক—মহারাজ পলায়ন করুন।"

মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বয়স্যদের দিকে চাহিলেন; তাঁহার তিন বৎসরব্যাপী রাজ্যকালে এরূপ কাণ্ড কখনও ঘটে নাই। তিনি বলিলেন,—"নারী—আমার নিকট কি চায়?"

এই সময় যবনী প্রতীহারী প্রবেশ করিয়া জানাইল যে, বৈশালী হইতে এক নারী রাজকার্য্য উপলক্ষে মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী। মহারাজ ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"লইয়া এস।"

প্রতীহারী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পরক্ষণেই চারিদিকে রূপলাবণ্যের স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়া উল্কা কক্ষে প্রবেশ করিল।

মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, উল্কা প্রবেশ করিতেই উভয়ের চোখোচোখি হইল। পাঁচ গণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, উল্কা ও সেনজিৎ ততক্ষণ পরস্পর চোখের ভিতর চাহিয়া রহিলেন। উল্কার চোখে গোপন উৎকণ্ঠা, মহারাজের নয়নে প্রচ্ছন্ন বিস্ময়! তারপর দু'জনেই চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

মহারাজ সেনজিৎ ভূমির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভদ্রে, শুনিলাম তুমি বৈশালী হইতে আসিতেছ; তোমার কি প্রয়োজন?"

উল্কার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দশনপংক্তি ঈষৎ দেখা গেল। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া মহারাজের দিকে একটু অধীরভাবে তাকাইল, বলিল—"আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী—তাঁহার নিকটেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করিব।"

"আমিই সেনজিৎ।"

"মহারাজ! ক্ষমা করুন—" উল্কার বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্র ক্ষণেকের জন্য অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। তার পর সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বসিল; যুক্ত করপুট ললাটে স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল।

মহারাজ অস্ফুটভাবে কালোচিত সম্ভাষণ করিলেন। তখন উল্কা নিজ অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হস্তে দিল।

জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া সেনজিৎ পত্র পড়িতে লাগিলেন। উল্কা নতজানু থাকিয়াই আর একবার মহারাজকে নয়নকোণে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার মুখের ভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না, কিন্তু সে মনে মনে ভাবিল—"ইনিই মগধের মহাপরাক্রান্ত প্রজাপূজিত সেনজিৎ! ইঁহার চন্দন-চর্চ্চিত সুকুমার দেহে বলবীর্য্যের ত কোনও লক্ষণই দেখিতেছি না। এই সুখলালিত পৌরুষহীন বিলাসীকে জয় করিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে?" উল্কা মনে মনে অবজ্ঞার হাসি হাসিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া সেনজিৎ চক্ষু তুলিলেন; দেখিলেন, উল্কা তখনও নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছে। তিনি শুষ্কস্বরে বলিলেন—"ভদ্রে, আসন পরিগ্রহ কর। দেখিতেছি, তুমি মিত্ররাজ্য লিচ্ছবির প্রতিনিধি—সুতরাং আমরা তোমাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। বৈশালীর প্রজানায়কগণ যে একটি পুরঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে প্রেরণ

করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বটে, অপিচ কিছু বিস্ময়করও বটে।"

উল্কা আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাস্যে মহারাজের দিকে মুখ তুলিল, কিন্তু সে প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বেই বটুভট্ট তাহার অতি ক্ষীণ অথচ কর্ণবিদারী কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে, তাই তাহারা এই সুন্দরীকে পুরুষবেশে সাজাইয়া প্রেরণ করিয়াছে। মহারাজ, বৈশালী যখন আপনার মিত্ররাজ্য তখন মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ আপনিও কিছু পুরুষ বৈশালীতে প্রেরণ করুন। এইভাবে মিত্রতার বন্ধন অতিশয় দৃঢ় হইয়া উঠিবে।"

উল্কা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণ সে রাজা ভিন্ন অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত করে নাই, এখন খর্ব্বকায় বংশীকণ্ঠ বটুক ভট্টকে দেখিয়া তাহার অধরে বিদ্রূপের হাসি ফুটিল। সে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল—"মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই বোধ হয় মহামান্য কুলপতিগণ এই পুরকন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন। নচেৎ লিচ্ছবি দেশে প্রকৃত পুরুষের অভাব নাই।"

ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বটুক ভট্ট বলিল—"বৈশালীকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকিত, তবে তাহারা কখনই তোমাকে মগধে আসিতে দিত না।"

উল্কার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে চকিতে রাজার দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "মহারাজ, এই বিট কি আপনার বাক্‌-প্রতিভূ?"

সেনজিৎ উত্ত্যক্তভাবে বিদূষকের দিকে চাহিলেন, কহিলেন, "বটুক, চপলতা সংবরণ কর, এ চপলতার সময় নয়!"

বটুক ভীতভাব প্রদর্শন করিয়া জানু-সাহায্যে হাঁটিয়া একজন বয়স্যের পিছনে লুকাইল।

সেনজিৎ তখন বলিলেন—"ভদ্রে—"

উল্কার মুখ আবার প্রসন্ন হইল, সে হাস্য-মুকুলিত অধরে বলিল—"দেব, আমার নাম উল্কা।"

বটুক ভট্ট অন্তরাল হইতে আতঙ্কের অভিনয় করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"উঃ!"

সেনজিৎ একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—"ভাল। উল্কা, পুনর্ব্বার তোমাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বৈশালী রাষ্ট্রের মিত্রতার চিহ্ন নারী বা পুরুষ যে মূর্ত্তিতেই আগমন করুক, আমাদের সমাদরের সামগ্রী। কল্য হইতে সভায় অন্যান্য মিত্রগণের মধ্যে তোমার আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে।"

উল্কা অকপট-নেত্রে চাহিয়া বলিল—"সভায় নিত্য নিয়ত উপস্থিত থাকা কি আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য? রাজকীয় সভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না—এই আমার প্রথম দৌত্য।" বলিয়া একটু লজ্জিতভাবে হাসিল।

সেনজিৎ বলিলেন—"সভায় উপস্থিত থাকা না থাকা পাত্রমিত্রের প্রয়োজন ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। তুমি ইচ্ছা করিলে না আসিতে পার।"

উল্কা শুধু বলিল—"ভাল, মহারাজ!"

উক্তরূপ কথোপকথন হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, মহারাজ সেনজিৎ রাজকার্য্য অমাত্যদের হস্তে অর্পণ করিলেও নিজে একান্ত অপটু ছিলেন না।

অতঃপর তিনি বলিলেন—"বহু দূরপথ অতিক্রম করিয়া তুমি ও তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণে সময় না থাকায় তোমার সমুচিত আবাস-গৃহের ব্যবস্থা হইতে পায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে—"

বটুক ভট্ট উঁকি মারিয়া বলিল,—"কেন, মহারাজের অন্তঃপুর ত শূন্য আছে—সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হউক না।"

মহারাজ রুষ্টমুখে তাকাইলেন।

কিন্তু উল্কার চোখে গোপনে বিজলি খেলিয়া গেল; সে ভ্রূভঙ্গ করিয়া মহারাজের দিকে মুখ তুলিল—"মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য! তবে কি মহারাজ অকৃতদার!"

অপ্রসন্ন ললাটে সেনজিৎ নীরব রহিলেন; কেবল বটুক ভট্ট সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

উল্কা তখন বলিল—"মহারাজ, সত্যই আমরা পথশ্রান্ত। যদি আপনার অপ্রীতিকর না হয়, তবে অবরোধেই আশ্রয় লইতে পারি। আমি নারী, সুতরাং অবরোধে মহারাজের আশ্রয়াধীনে থাকাই আমার পক্ষে সুষ্ঠু হইবে।"

ভ্রূবদ্ধ ললাটে মহারাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর বিরস স্বরে বলিলেন—"ভাল। আপাততঃ অন্তঃপুরেই বাস কর, আমি সেখানে পদার্পণ করি না।" তার পর প্রধানা যবনীকে ডাকিয়া তাহাকে যথোচিত উপদেশ দিয়া বলিলেন—"ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিও। পরে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি।"

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল। "জয়োস্তু মহারাজ!" বলিয়া সে যবনী সমভিব্যাহারে রাজসকাশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, এমন সময়ে বটুকের মুণ্ড আর একবার উঁচু হইয়া উঠিল। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—"বৈশালিকে, রাজকার্য্য ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, এখন একটি প্রশ্ন করিতে পারি? বৈশালীর সকল সীমন্তিনীই কি সদাসর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকে? ভ্রূকুটির ভল্ল ও বক্ষের লৌহজালিক কি তাহারা উন্মোচন করে না?"

প্রস্থানোদ্যতা উল্কা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অনুচ্চস্বরে বলিল—"তোমার মত কিম্পুরুষ দেখিলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্র ত্যাগ করে।" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে যবনী তূণীর হইতে একটি তীর তুলিয়া লইয়া নিক্ষেপ করিল। বটুক ভট্ট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তীর তাহার মস্তকশীর্ষস্থ কুণ্ডলীকৃত কেশকলাপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উল্কা চকিতচপল নেত্রে একবার সেনজিতের মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যবিম্বিত রক্তাধরে কৌতুক বিচ্ছুরিত করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তীর জটা হইতে বাহির করিবার জন্য বটুক টানাটানি করিতে লাগিল। মহারাজ তাহার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—"তোমার প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—বৈশালিকার লক্ষ্যবেধ অব্যর্থ। তুমি আর উহার সহিত রসিকতা করিতে যাইও না।"

বটুক তীরফলক অতিকষ্টে কেশ হইতে মুক্ত করিয়া করুণ স্বরে বলিল,—"না মহারাজ, আর করিব না। একাদশ রুদ্রের কোপ ও দ্বাদশ সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে পারি; কিন্তু আগুন লইয়া খেলা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর সহ্য হইবে না।"

মহারাজ বলিলেন—"এখন যাও, কঞ্চুকীকে ডাকিয়া আনো, তিনি আসিয়া অন্তঃপুরের সুব্যবস্থা করুন।"

বটুক ভট্ট অমনই উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, বলিল—"তাহাই করি। তবু যদি দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হন।"

'দেবী' শব্দের মধ্যে হয় ত একটা ব্যঙ্গার্থ ছিল, মহারাজের কর্ণে সেটা বিঁধিল; কিন্তু তিনি কোনও প্রকার প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বেই ধূর্ত্ত বটুক ভট্ট কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। উল্কা সখীপরিজনবেষ্টিতা হইয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিল। পুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কোনও আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না—মহারাজও অন্য বাসভবনের উল্লেখ করিলেন না। বৃদ্ধ কঞ্চুকী বহুদিন পরে নিজ কার্য্য ফিরিয়া পাইয়া মহা উৎসাহে উল্কার তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেলেন। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটির ছিদ্র রহিল না।

রাজসভাতেও উল্কা কয়েক দিন নিজ আসনে গিয়া বসিল। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণের ভিতর উল্কার অলোকসামান্য রূপ যেন শারদ মেঘাচ্ছন্ন শশি-কলার প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল। রাজসভা এই নবচন্দ্রোদয়ে কুমুদ্বতীর মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে সভাসদগণের মধ্যে নানা উৎসুক জল্পনা চলিতে লাগিল।

মহারাজ সেনজিৎ কিন্তু তাঁহার নিরুৎসুক নিস্পৃহতার মধ্যে অটল হইয়া রহিলেন। উল্কাকে তিনি পদোচিত মর্য্যাদা ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু তাহার বেশী কিছু নয়। উল্কা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল, মহারাজের আচরণে নারীজাতি সম্বন্ধে একটা নীরস ঔদাসীন্যের ভাব রহিয়াছে—রাজন্যবর্গের পক্ষে ইহা যেমন অসাধারণ, তেমনই বিস্ময়কর। উল্কা হতাশ হইল না, বরঞ্চ মহারাজকে কুহকমন্ত্রে পদানত করিবার সঙ্কল্প তাহার কুলিশ-কঠিন হৃদয়ে আরও দৃঢ় হইল।

কিন্তু একদিন রাজসভায় একটি ঘটনা দেখিয়া উল্কা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইল। মহারাজের ব্যবহারে অনাড়ম্বর মৃদুতা দর্শনে উল্কার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সেনজিৎ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রকৃতি—চিত্তের দৃঢ়তা বা পুরুষোচিত সাহস তাঁহার নাই। এই ভ্রান্তি তাহার সহসা ভাঙ্গিয়া গেল।

মহারাজ সেনজিৎ সেদিন যথারীতি সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সভামধ্যে চন্দ্রের রহস্যময় মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জল্পনা ও কৌতুককর অনুমান চলিতেছিল, উল্কা আকুঞ্চিত অধরে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে শুনিতেছিল, এরূপ সময় রাজ-মহামাত্র দৌড়িতে দৌড়িতে সভায় প্রবেশ করিয়া বলিল—"আয়ুষ্মন্, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, পুরুষ ক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।

'পুরুষ' রাজার পট্ট হস্তীর নাম। এই সংবাদ শুনিয়া সভামধ্যে বিষম চাঞ্চল্য ও গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু সেনজিৎ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তোমরা শান্ত হও, ভয় নাই—আমি দেখিতেছি।" বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে চলিলেন।

মহামাত্র সভয়ে বলিল—"আয়ুষ্মন্, পুরুষ তাহার রক্ষককে শুণ্ডাঘাতে বধ করিয়াছে, আমিও তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। এ অবস্থায় আপনি তাহার সম্মুখীন হইলে—"

মহারাজ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বহু স্তম্ভযুক্ত উন্মুক্ত সভামণ্ডপের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যতশুণ্ড প্রকাণ্ড উন্মত্ত হস্তী বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হস্তীর গণ্ড হইতে মদবারি ক্ষরিত হইতেছে, চরণে ছিন্ন শৃঙ্খল, ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় কষায়বর্ণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সভাসদ্‌গণ কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় হতগতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উল্কাও নিজ আসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বিস্ফারিত-নয়নে স্পন্দিতবক্ষে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে বাক্য সরিল না।

সেনজিৎ সভাচত্বর হইতে অবতরণ করিয়া হস্তীর আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। মদস্রাবী মাতঙ্গ প্রহার-উদ্যমে শুণ্ড ঊর্দ্ধে তুলিল। তখন সেই

রুদ্ধশ্বাস নীরবতার মধ্যে সেনজিৎ মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন—"পুষ্কর! পুষ্কর!"

পুষ্করের শুণ্ড ঘোরবেগে অবতরণ করিতে করিতে অর্দ্ধ-পথে থামিয়া গেল। মত্ত হস্তী রক্তনেত্রে মহারাজের দিকে চাহিয়া যেন বিদ্রোহ করিতে চাহিল, একবার দ্বিধাভরে তাহার করদণ্ড ঈষৎ আন্দোলিত হইল—তার পর ধীরে ধীরে শুণ্ড অবনমিত করিয়া সে নম্রভাবে দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবনমৃগে পরিণত হইল।

মহারাজ সস্নেহে তাহার শুণ্ডে হাত বুলাইয়া তাহার কানে কানে কি বলিলেন; পুষ্করের প্রকাণ্ড দেহ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল, সে অধোবদনে ধীরে ধীরে পশুশালা অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। মহারাজ তাহার সঙ্গে চলিলেন। এতক্ষণে হস্তিপক সাহস পাইয়া মহারাজের অনুবর্ত্তী হইল।

এই ঘটনা উল্কার মনে গভীর রেখাপাত করিল। শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতে নাই; উল্কাও মাহরাজ সম্বন্ধে সতর্ক ও অবহিত হইয়া তাঁহাকে জালবদ্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ওদিকে মহারাজ সেনজিৎ বর্ম্মাচ্ছাদিত যোদ্ধার ন্যায় অক্ষতদেহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে কন্দর্পজনিত কোনও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে কি না কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

একদা প্রাতঃকালে মহারাজ যথাবিহিত স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া পক্ষি-ভবনে গমন করিলেন। পক্ষিপালন মহারাজের অতি প্রিয় ব্যসন; বহু-জাতীয় বিহঙ্গ তাঁহার পক্ষিশালায় নিরন্তর কলরব করিত, তিনি প্রত্যহ প্রাতে স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার করাইতেন।

একটি শুক স্বর্ণদণ্ডের উপর বসিয়াছিল, সেনজিৎ তাহার নিকটে

যাইতেই সে ডানা ঝটপট করিয়া উড়িয়া গেল। তাহার চরণের স্বর্ণ-শৃঙ্খল কোনও উপায়ে কাটিয়া গিয়াছিল ; মহারাজ দেখিলেন, শুক উড়িয়া অন্তঃপুরসংলগ্ন উপবনের এক আমলকী-বৃক্ষের শাখায় গিয়া বসিল।

এই শুক মহারাজের অতি আদরের পক্ষী, বহুকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া ভাল উড়িতেও পারে না। তাহাকে ধরিবার জন্য কি করা যায়, মহারাজ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিলক-পুণ্ড্রক-চিত্রিত ললাটে বটুক ভট্ট আসিয়া স্বস্তিবাচন করিল। তাহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন—"ভালই হইল। বটুক, আমার শুকপাখীটা উড়িয়া গিয়া অন্তঃপুরের ঐ আমলকী-বৃক্ষে বসিয়াছে। তুমি যাও, উহাকে ধরিয়া আন। উদ্যান-পালিকাকে বলিলেই সে ধরিয়া দিবে।"

বটুক ভট্টের চক্ষু গোলাকৃতি হইল, সে বলিল—"রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহূতভাবে রাজ-অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিত হইবে ? লোকে যদি নিন্দা করে ?"

"নিন্দা করিবে না—তুমি যাও।"

বটুক অতিশয় গম্ভীরমুখে বলিল—"অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়—"

মহারাজ শ্লেষ করিয়া বলিলেন—"এত ভয় কিসের ?"

তখন সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িল, বটুক কম্পিতস্বরে কহিল—"যদি আবার তীর ছোঁড়ে ?"

মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন—"ভয় নাই। রসিকতার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে আর কোনও বিপদ ঘটিবে না।"

ক্ষুব্ধস্বরে বটুক বলিল—"যাইতেই হইবে ?"

তাহার কাতরভাব দেখিয়া মহারাজ স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"হাঁ।"

সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক বটুক অনিচ্ছা-মন্থরপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিল, মহারাজকে শুনাইতে শুনাইতে গেল—"এই জন্যই প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে। সামান্য একটা পক্ষীর জন্য—"

কয়েক পদ গিয়া বটুক আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—"মহারাজ, আমি বলি, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না, দু'জন থাকিলে বিপদে আপদে পরস্পরকে রক্ষা করিতে পারিব।"

মহারাজ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—"মূর্খ, আমিই যদি যাইব, তবে তোমাকে পাঠাইতেছি কেন?"

বটুক ভট্ট তখন জোড়করে করুণবচনে বলিল—"মহারাজ, রক্ষা করুন, আমাকে একাকী পাঠাইবেন না। ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি।"

মহারাজের স্মিতমুখে ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ ভাবান্তর দৃষ্ট হইল; তিনি যেন বিমনা হইয়া কি ভাবিলেন। তার পর বাহিরে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"না, তুমি একাকী যাও, আমি যাইব না।"

এবার বটুক ভট্ট প্রতিশোধ লইল, রাজার বাক্য ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"কেন, আপনার এত ভয় কিসের?"

রুষ্ট বিস্ময়ে মহারাজ বলিলেন—"ভয়? আমি কি তোমার মত শিখা-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ!" বটুক উত্তর দিল না, শুধু মিটিমিটি চাহিতে লাগিল। তখন মহারাজ অধীরভাবে বলিলেন—"ভাল, একাকী যাইতে ভয় পাও, চল, আমি রক্ষক হিসাবে যাইতেছি। নারী-ভয়ে ভীত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবতঃ রাজধর্ম্ম।"

রাজা অগ্রবর্ত্তী হইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বটুক ভট্টের কণ্ঠ হইতে একবার একটা অবরুদ্ধ হাসির শব্দ বাহির হইল।

রাজা সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে ফিরিলেন ; কিন্তু বটুক ভট্টের মুখে দুর্জ্জয় গাম্ভীর্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সঙ্কীর্ণ পরিখার ভিতর অনুচ্চ প্রাকার-বেষ্টনী—তন্মধ্যে রাজ-অবরোধের চক্রাকৃতি বিস্তীর্ণ ভূমি। ভূমির কেন্দ্রস্থলে সৌধ—চতুর্দ্দিকে নানা বৃক্ষ-লতা-শোভিত উপবন।

উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক কয়েক পদ গমন করিবার পর মহারাজ সেনজিতের গতি ক্রমশ শ্লথ হইয়া শেষে থামিয়া গেল। যে আমলকী-বৃক্ষটা তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহার অনতিদূরে এক পুষ্পিত রক্ত-কুরুবকের ছায়ায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, সদ্যস্নাতা উল্কা একাকিনী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কর্ণে কুরুবক-কোরকের অবতংস পরিতেছে! তাহার কটিতটে চম্পকবর্ণ সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, বক্ষে কাশ্মীর-রঞ্জিত নিচোল—উত্তরীয় নাই। দর্পণের ন্যায় ললাটে কুঙ্কুম-তিলক, চরণপ্রান্তে লাক্ষারাগ, সিক্ত অবেণীবদ্ধ কুন্তলভার পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া যেন এই সম্মোহিনী প্রতিমার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।

মহারাজের উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া উত্তেজিত নিম্নস্বরে বটুক ভট্ট বলিল,—"মহারাজ, দেখুন, দেখুন, সাক্ষাৎ কন্দর্পের জয়শ্রী বৃক্ষতলে আবির্ভূতা হইয়াছে। হে কন্দর্পারি, এই দুরন্ত বসন্তকালে তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

পরিপূর্ণ নারীবেশে মহারাজ ইতিপূর্ব্বে উল্কাকে দেখেন নাই—আজ প্রথম দেখিলেন। উল্কা যখনই প্রকাশ্যে বাহির হইয়াছে, নারীসুলভ প্রসাধন বর্জ্জন করিয়া দৃপ্ত যোদ্ধ বেশে দেখা দিয়াছে। তাই আজ তাহার সুকুমার নারীমূর্ত্তি যেন দর্শকের চিত্তে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিল।

উল্কাও দূর হইতে মহারাজকে দেখিতে পাইয়াছিল ; সে রিমঝিম

মঞ্জরীর বাজাইয়া, অঙ্গসঞ্চালনে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। জঘনভারমন্থর মদালস গতি, যেন প্রতি পদক্ষেপে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উত্তরীয়ের অভাবে ব্যক্ত দেহভাগ সুমধুর নির্লজ্জতায় নিজ গৌরব-গর্ব্ব ঘোষণা করিতেছে। মন্ত্ররুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় মহারাজ স্থির হইয়া রহিলেন।

উল্কা মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখে একটু ভঙ্গুর হাসি, আয়ত চক্ষুপল্লবে শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া। উল্কা মহারাজের পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিল, কূজন-মধুর স্বরে বলিল—"প্রভাতে উঠিয়া রাজদর্শন করিলাম, আজ আমার সুপ্রভাত। দেবপ্রিয়, দাসীর অর্ঘ গ্রহণ করুন। বলিয়া কপোতহস্তে কয়েকটি কুরুবক-কলি তুলিয়া ধরিল।

মহারাজ মূক হইয়া রহিলেন।

বটুক ভট্ট উল্কার আগমনে মহারাজের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া বহু অলঙ্কারযুক্ত ভাষায় সাড়ম্বরে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মহারাজের চমক ভাঙ্গিল।

আত্মবিস্মৃতির তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াই মহারাজ মুখভাব কঠিন করিলেন, ললাটে ভ্রূকুঞ্চন দেখা দিল। তিনি ধীর-হস্তে উল্কার অঙ্গুলি হইতে একটি পুষ্প তুলিয়া লইয়া সংক্ষিপ্ত স্বরে বলিলেন—"স্বস্তি!"

উল্কা চপলনেত্রে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কর্ণভূষণ দুলাইয়া পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল—"মহারাজ, এতদিনে বিদেশিনীকে স্মরণ হইল? রাজকার্য্য কি এতই গুরু?"

উল্কাকে এত হাস্যরহস্যময়ী মহারাজ পূর্ব্বে দেখেন নাই; কিন্তু তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন—"আমার একটা শুকপক্ষী উড়িয়া ঐ আমলকী-বৃক্ষে বসিয়াছে, তাহাকে ধরিতে আসিয়াছি।"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উল্কা বলিল—"সত্য? কৈ আসুন ত দেখি।"

ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকা যেন নূতন খেলার উপাদান পাইয়াছে, এমনই ভাবে চটুলপদে উল্কা আগে চলিল, মহারাজ তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। যাইতে যাইতে গ্রীবা বাঁকাইয়া উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, আপনার শুকের নাম কি?"

মহারাজ গম্ভীর-মুখে বলিলেন,—"বিম্বোষ্ঠ।"

"বিম্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম!—কঞ্চুকী মহাশয় আমাকেও একটা শুকপক্ষী দিয়াছেন—সে ইহারই মধ্যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। কি নাম রাখি বলুন ত?"

মহারাজ ললাটের উপর দিয়া একবার হস্তচালনা করিলেন, উল্কার পক্ষীর নামকরণ সহসা করিতে পারিলেন না।

ক্রমে উভয়ে আমলকী বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। রাজা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সাবধানী বটুক তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছে। তিনি মনে মনে ভীরু ব্রাহ্মণকে কটূক্তি করিলেন।

আমলকীবৃক্ষ বসন্ত ঋতুর সমাগমে নবপত্রে শোভিত হইয়াছে, তাহার ভিতরে হরিদ্বর্ণ পক্ষী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। উল্কা ও মহারাজ ঊর্দ্ধমুখ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সহসা উল্কা সেনজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখুন মহারাজ, ঐ দেখুন, আপনার ধূর্ত্ত বিম্বোষ্ঠ পত্রান্তরালে বসিয়া ফল ভক্ষণ করিতেছে।"

মহারাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন, তারপর রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"বিম্বোষ্ঠ, নামিয়া আয়!"

মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বিম্বোষ্ঠ নখধৃত ফল ফেলিয়া দিয়া

সতর্কভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নীচের দিকে তাকাইল, কিন্তু নামিয়া আসিবার জন্য কোনও ব্যস্ততা প্রদর্শন করিল না।

মহারাজ আবার তর্জ্জন করিলেন—"বিম্বোষ্ঠ, শীঘ্র নামিয়া আয়!"

কোনও ফল হইল না ; বিম্বোষ্ঠ পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

উল্কা বিভক্ত ওষ্ঠাধরে দেখিতেছিল, এবার সে পলাতক মুক্তিবিলাসী পক্ষীকে আহ্বান করিল ; ভ্রূবিলাস করিয়া কপট ক্রোধমিশ্রিত কৌতুকের স্বরে বলিল—"ধৃষ্ট পাখী, মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে তোর সাহস হয়? এখনও নামিয়া আয়, নচেৎ তোর দুই পায়ে শিকল দিয়া পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিব।

এত বড় শাসনবাক্যেও বিদ্রোহী পাখী অটল রহিল। তখন উভয়ে বহু প্রকারে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, উল্কা আরক্ত বিম্বাধর স্ফুরিত করিয়া, করকঙ্কণ কণিত করিয়া তাহাকে তর্জ্জন অনুনয় করিল ; কিন্তু বিম্বোষ্ঠ গ্রাহ্য করিল না।

তখন সেনজিৎ হতাশ হইয়া বলিলেন—"এখন উপায়?"

উল্কা গণ্ডে তর্জ্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল। তার পর সহসা মুখ তুলিয়া বলিল—"উপায় আছে, মহারাজ! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।" বলিয়া রহস্যময় হাসিয়া দ্রুতশিঞ্জিত চরণে ভবন অভিমুখে প্রস্থান করিল। সেনজিৎ তাঁহার চঞ্চল নিতম্বলুণ্ঠিত কেশজালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে উল্কা ফিরিয়া আসিল। মহারাজ দেখিলেন, তাহার মণিবন্ধে একটি দীর্ঘপুচ্ছ শুক পক্ষী।

মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"পাখী দিয়া পাখী ধরিবে?"

উল্কা পূর্ণ-দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে তাকাইল, বলিল—"হাঁ। কেন, তাহা কি অসম্ভব ?"

মহারাজের গণ্ড ঈষৎ উত্তপ্ত হইল, তিনি পুনর্ব্বার কণ্ঠস্বর নীরস করিয়া বলিলেন—"বলিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।"

উল্কা তখন মৃদুহাস্যে বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কুহক-মধুর স্বরে ডাকিল,—"আয় আয় বিম্বোষ্ঠ! এই ত্থাখ, তোর সাথী তোর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আয়!"

বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তার পর উড়িয়া আসিয়া উল্কার অংসের উপর বসিল।

বিজয়োজ্জ্বল দৃষ্টিতে উল্কা বলিল—"দেখিলেন, মহারাজ ?"

"দেখিলাম।"

দুই পক্ষী কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিল। তার পর বিম্বোষ্ঠ অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করিয়া উল্কার কর্ণবিলম্বী রক্তবর্ণ কুরুবক-মুকুলে চঞ্চু বসাইয়া টান দিল।

উল্কা বিপন্নভাবের বিভ্রম করিয়া বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, রক্ষা করুন, আপনার দস্যু পক্ষী আমার কর্ণভূষা হরণ করিতে চায়।"

সেনজিৎ পক্ষীকে ধরিতে গেলেন। পাখী ঝটপট করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু মহারাজ তাহার চরণবিলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলের অংশ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাখী পলাইতে পারিল না—মহারাজের উন্মুক্ত বক্ষের উপর গিয়া পড়িল। ভীত পক্ষীর তীক্ষ্ণ নখ তাঁহার বক্ষে অবলম্বন অন্বেষণ করিতে গিয়া কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে নখচিহ্ন রক্তিম হইয়া উঠিল; তার পর দুই বিন্দু রক্ত ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

উল্কা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! মহারাজ, এ কি হইল!—ওরে কে আছিস্, শীঘ্র আয়! বান্ধুলি! বিপাশা!—শীঘ্র অনুলেপন লইয়া আয়! মহারাজ আহত হইয়াছেন।"

মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, তিনি প্রায় রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র।"

"সামান্য নখক্ষত! মহারাজ কি জানেন না, পশু-পক্ষীর নখে বিষ থাকে?" ব্যাকুলভাবে গৃহের দিকে তাকাইয়া বলিল—"কৈ, কেহ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে দেহে প্রবেশ করিবে। বান্ধুলি! সুজাতা!"

মহারাজ আবার আরক্তমুখে আপত্তি করিলেন। তখন উল্কা হঠাৎ যেন পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, আপনি স্থির হইয়া দাঁড়ান, আমি বিষ নিষ্কাশন করিয়া লইতেছি!"

উল্কার উদ্দেশ্য মহারাজ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই সে মহারাজের একেবারে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তার পর দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর তাহার কোমল অধরপল্লব স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া রহিলেন, তার পর সবলে নিজেকে উল্কার আশ্লেষমুক্ত করিয়া লইয়া পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

উল্কার অধরে মহারাজের বক্ষ-শোণিত। সে অর্দ্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল,—"কি হইল!"

তিক্ত ঘৃণাজর্জ্জরিতস্বরে সেনজিৎ বলিলেন—"নারীর পুরুষভাব আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য!" বলিয়া উল্কার দিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ মহারাজকে দেখা গেল, উল্কা স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তার পর

সে সজোরে দন্ত দিয়া অধর দংশন করিল। মহারাজের বক্ষোরুধিরে উল্কার রুধির মিশিল।

প্রত্যাখ্যাতা খণ্ডিতা নারীর চিত্ত-গহনে কে প্রবেশ করিবে? শিকার-বঞ্চিতা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধিত জিঘাংসাই বা কে পরিমাপ করিতে পারে? উল্কার নয়নে যে বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার অন্তর্গূঢ় রহস্য নির্ণয় করা মানুষের সাধ্য নয়। বোধ করি দেবতারও অসাধ্য।

৮

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনজিৎ রাজোদ্যানে একাকী বিচরণ করিতেছিলেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মন্দীভূত হইয়া অগ্নিকোণ হইতে মৃদু শীতল মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুদূর চম্পারণ্যের চাঁপার বন হইতে সুগন্ধ আহরণ করিয়া মহারাজের আতপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মহারাজের চক্ষের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁহার অশান্ত চিত্তের প্রতিচ্ছবি বহন করিতেছিল। পাদচারণ করিতে করিতে তিনি অন্যমনে যূথী-গুল্ম হইতে পুষ্প তুলিয়া নখে ছিন্ন করিতেছিলেন, কখনও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আকাশে যেখানে সূর্য্যাস্তের বর্ণ বিলাস চলিতেছিল সেই দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন।

এই সময় রাজ্যের মহামাত্য ধীরপদে আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাঁড়াইলেন। অপ্রসন্ন সপ্রশ্ন মুখে মহারাজ তাঁহার প্রতি চাহিলেন। কোনও কথা হইল না, মন্ত্রী নীরবে একটি ক্ষুদ্র লিপি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন।

ভূর্জ্জপত্রে লিখিত লিপি; তাহাতে এই কয়টি কথা ছিল—

—"বৈশালিকা নারী সম্বন্ধে সাবধান। কোনও কুটিল উদ্দেশ্যে সে মগধে প্রেরিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহারাজাকে রূপমোহে বশীভূত করিয়া লিচ্ছবির কার্য্যসিদ্ধি করা তাহার অভিপ্রায়।"

পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ আরক্ত মুখ তুলিলেন; মন্ত্রী অন্য দিকে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিলেন—"বৈশালী হইতে আমাদের গুপ্তচর অদ্য এই পত্র পাঠাইয়াছে।"

মহারাজ কথা কহিলেন না, লিপির দিকে কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ভূর্জ্জপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিলেন। মন্ত্রী অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া পুনর্ব্বার মহারাজকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল, আকাশের আভুগ্ন চন্দ্রকলা এতক্ষণ মলিন-মুখে ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীর তিরোভাবে এখন যেন বাঁকা হাসি হাসিয়া উঠিল। মহারাজের সন্নিধাতা স্বর্ণপাত্রে স্নিগ্ধ আসব লইয়া উপস্থিত হইলে মহারাজ একনিশ্বাসে সুরা পান করিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন!

তার পর একে একে বয়স্যরা আসিল। কিন্তু মহারাজের মুখে প্রকট বিরক্তি ও নির্জ্জনবাসের স্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা সঙ্কুচিতভাবে অপসৃত হইয়া গেল। বটুক ভট্ট আসিয়া মহারাজের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিল, তাহার চটুলতা কিয়ৎকাল ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, বলিলেন—"বটুক, তোমাকে শূলে দিবার ইচ্ছা হইতেছে।"

বটুক দ্রুত পলায়ন করিতে করিতে বলিল—"মহারাজ, ও ইচ্ছা দমন করুন, আমি শয্যায় শুইয়া শুইয়া মরিতে চাই।"

রাত্রি ক্রমশ গভীর হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত সন্নিধাতা মহারাজের আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কাছে আসিতে সাহস করিল না।

সদা-প্রসন্ন মহারাজের এরূপ ভাবান্তর পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাজপুরীর সূপকার হইতে সম্বাহক পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই কানে কানে বার্ত্তা প্রচারিত হইয়া গেল—দেবপ্রিয় মহারাজের আজ চিত্ত সুস্থ নাই। যবনী প্রতীহারীরা ঊর্দ্ধ-চোখে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহাদের বর্ম্মাচ্ছাদিত বক্ষও মহারাজের জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সেনজিৎকে রাজ্যের আপামর সাধারণ সকলেই ভালবাসিত। বিশেষতঃ পুরপরিজন তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত, তাঁহার অল্পমাত্র ক্লেশ দূর করিবার জন্য বোধ করি প্রাণ দিতেও কেহ পরাঙ্মুখ হইত না। রাজা যেখানে প্রজার বন্ধু সেখানে এমনই হয়। কিন্তু তবু আজিকার এই মধুর বসন্ত রজনীতে মহারাজ বক্ষে অজ্ঞাত সন্তাপের অগ্নি জ্বালিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পাত্রমিত্র বয়স্য পরিজন কেহ সান্ত্বনা দিবার জন্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে যখন আর বিলম্ব নাই তখন মহারাজ দ্রুত পাদচারণ করিতে করিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিস্তব্ধ বাতাসে সুমধুর বীণা-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ধ্বনি অন্তঃপুরের দিক হইতে আসিতেছে। অতি মৃদু ধ্বনি, কিন্তু যেন প্রাণের দুরন্ত আক্ষেপভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ব্যাধ-বংশী-আকৃষ্ট মৃগের মত মহারাজের পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে ঐ বীণাধ্বনির দিকে অগ্রসর হইল, তিনি পরিখার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিখার পরপারে প্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া কে বীণা বাজাইতেছে। ক্রমে বীণাধ্বনির সহিত একটি কণ্ঠস্বর মিশিল। তরল খেদ-বিগলিত কণ্ঠস্বর—মনে হয় যেন জ্যোৎস্না কুহেলির সহিত মিশিয়া মিলাইয়া

যাইতেছে। মহারাজ তন্ময় একাগ্র হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রথমে দুই একটি কথা, তার পর সম্পূর্ণ সঙ্গীত তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

আধ-আধ প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত সঙ্গীত, তাহার মর্ম্ম—

হায় ধিক্ কন্দর্পদর্পাহতা!
মন্মথ তোমার মন মথন করিল,
প্রিয়জনকে নিকটে পাইয়া তুমি লজ্জা বিসর্জ্জন দিলে?
হায় কেন লজ্জা বিসর্জ্জন দিলে?
প্রিয়জনের ঘৃণা তোমার অঙ্গ দহন করিল,
মদন তোমার অন্তর দহন করিল—
তুমি অন্তরে বাহিরে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইলে!
হায় ধিক্ কন্দর্পদর্পাহতা!

বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে সঙ্গীত মিলাইয়া গেল। মহারাজ কয়েক মুহূর্ত্ত পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর ঊর্দ্ধশ্বাসে সে স্থান ছাড়িয়া উদ্যান উত্তীর্ণ হইয়া নিজ শয়নভবনে প্রবেশ করিলেন।

শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নি অধিক জ্বলে। সে রাত্রে মহারাজের নয়নে নিদ্রা আসিল না।

* * * *

একে একে ফাল্গুনের মদোচ্ছ্বাসিত দিনগুলি কাটিতে লাগিল। মহারাজের চিত্তে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই—তিনি দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন।

মহারাজের প্রকৃতি যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অকারণ ক্রোধ—যাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই—তাঁহার প্রতি কার্য্যে প্রতি সম্ভাষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষের সাহচর্য্য বিষবৎ অসহ্য হইয়া

উঠিল। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত উদ্যানে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করা তাঁহার নিত্যকার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

একমাত্র বটুক ভট্টই বোধ হয় মহারাজের চিত্তবিক্ষোভের যথার্থ কারণ অনুমান করিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ বাহিরে মূর্খতার ভাণ করিলেও ভিতরে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন—সে ঘুণাক্ষরে কাহারও কাছে কোনও কথা প্রকাশ করিল না। নারীবিদ্বেষী মহারাজের এত দিনে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা তিনি স্বয়ং যখন গোপন করিতে চান তখন তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে তাঁহার লজ্জা বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আপাততঃ এ কথা প্রচ্ছন্ন রাখাই শ্রেয়। মহারাজ যখন কন্দর্পের নিকট পরাভব স্বীকার করিবেন, তখন আপনিই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু মহারাজের চিত্তে প্রফুল্লতা আনয়ন করিবার চেষ্টা বটুক ভট্টের সফল হইল না। সে সহজভাবে ইহাই বুঝিয়াছিল যে, মহারাজ যখন উল্কার প্রতি মনে মনে অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন উভয়ের মিলন ঘটাইতে পারিলেই সব গণ্ডগোল চুকিয়া যাইবে। মহারাজের নারীবিদ্বেষ ও বিবাহে অনিচ্ছা যদি এইভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তবে ত সব দিক দিয়াই মঙ্গল। মগধের পট্টমহাদেবী হইতে উল্কার সমকক্ষ আর কে আছে?—এই ভাবিয়া বটুক তাহার সমস্ত ছলা-কলা ও রঙ্গভঙ্গ ঐ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিয়াছিল। কিন্তু হায়, মহারাজের হৃদয় মন্থন করিয়া যে একই কালে অমৃত ও গরল উঠিয়াছে, তাহা অনুগত বটুক জানিতে পারে নাই।

এমনই ভাবে দিনগুলি ক্ষয় হইতে লাগিল, ওদিকে আকাশে চন্দ্রদেব পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে একদিন বসন্তোৎসবের মধুরাকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেশ সুদ্ধ নরনারী উৎসবে মাতিল। সকলের মুখেই আনন্দের—তথা

আসবের মদবিহ্বলতা। এমন কি যবনী প্রতীহারীরাও মাধ্বী পান করিয়া, অরুণায়িত-নেত্রে পরস্পরের অঙ্গে কুঙ্কুম-পরাগ নিক্ষেপ করিয়া, বীণ বাজাইয়া, দ্রাক্ষাবনের গীত গাহিয়া উৎসবে মগ্ন হইল।

কেবল মহারাজ সেনজিৎ ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে সহচরহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি ক্লান্তদেহে উদ্যানে গিয়া একটি মর্ম্মরবেদীর উপর উপবেশন করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিলেন। অমনি সম্মুখে পরিখার পরপারে অন্তঃপুর-ভবনের শুভ্রচূড়া চোখে পড়িল। মহারাজ সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন। উদ্যানে কেহ নাই, উদ্যান-পালিকারাও আজ উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে: মহারাজকে কেহ বিরক্ত করিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পূর্ব্ব-দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারিল। দিনের আলো সম্পূর্ণ নিভিয়া যায় নাই, অথচ চাঁদের কিরণ পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে—দিবা-রাত্রির এই সন্ধিক্ষণে মহারাজের চিত্তও কোন্ ধূসর বর্ণপ্রলেপহীন অবসন্নতায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাঁহার পাশে পড়িল। চকিতে মহারাজ তীরটি তুলিয়া লইলেন; তীরের অগ্রভাগে ধাতু-ফলকের পরিবর্ত্তে অশোকপুষ্প গ্রথিত, তীরগাত্রে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। কম্পিত হস্তে লিপি খুলিয়া মহারাজ পড়িলেন—লাক্ষারাগ দিয়া লিখিত লিপি—

"আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে নির্লজ্জা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে, মহারাজ একবার দর্শন দিবেন কি?"

মহারাজ পত্রখানি দুই হাতে ধরিয়া দুরন্ত আবেগে মুখের উপর চাপিয়া ধরিলেন। রুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"উল্কা মায়াবিনি—"

বাসনা প্রতিরোধেরও সীমা আছে! মহারাজ সেনজিতের অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হইল।

*　　*　　*　　*

সে দিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পর হইতেই উল্কা মনে মনে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ কয় দিন মহারাজ তাহাকে দেখেন নাই, কিন্তু সে সৌধশীর্ষ হইতে লুকাইয়া মহারাজকে দেখিয়াছিল। তাই মদনোৎসবের প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছিল—আজ তিনি আসিবেন। পুরুষের মন এত কঠিন হইতে পারে না, আজ মহারাজ নিশ্চয় ধরা দিবেন।

কর্পূর-সুবাসিত জলে স্নান করিয়া সে প্রসাধন করিতে বসিয়াছিল। সখীরা তাহাকে অপরূপ সাজে সাজাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তবু তাহার মনঃপূত হয় নাই। বারবার কবরী খুলিয়া নূতন করিয়া কবরী বাঁধিয়াছিল—অঙ্গের পুষ্পাভরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, চন্দনের পত্রলেখা মুছিয়া বক্ষে কুঙ্কুমের পত্রলেখা আঁকিয়াছিল, আবার তাহা মুছিয়া চন্দনের চিত্র লিখিয়াছিল। শেষে রাগ করিয়া সখীদের বলিয়াছিল—"তোরা কিছু জানিস্ না। আজ আমার জীবনের মহা সন্ধিক্ষণ, এমন করিয়া আমাকে সাজাইয়া দে—যাহাতে মহেশ্বরের মনও জয় করিতে পারি।"

সখীরা হাসিয়া বলিয়াছিল—"সে জন্য সাজিবার প্রয়োজন কি?"

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, মহারাজ আসিলেন না।

উল্কার পুষ্পাভরণ অঙ্গ-তাপে শুকাইয়া গেল, সে আবার নূতন পুষ্পভূষা পরিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইল, অপরাহ্ন ক্রমে সায়াহ্নে গড়াইয়া গেল, তবু মহারাজ দর্শন দিলেন না। সখীরা উল্কার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া ভীত হইল।

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদ-চূড়ে উঠিয়া উল্কা দেখিল—মহারাজ উদ্যানে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ বিপরীত দিকে। তিক্ত অন্তঃকরণে উল্কা ভাবিল—"ধিক আমাকে!"

তার পর মহারাজের সমীপে তীর নিক্ষেপ করিয়া, বসন-ভূষণ ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া উল্কা শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উল্কার চোখে বোধ করি জীবনে এই প্রথম অশ্রু দেখা দিল।

রাত্রি হইল। নগরীর প্রমোদ-কলরব ক্রমশ মৌন রসনিমগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্র মধ্যগগনে আরোহণ করিলেন।

উল্কার সখীরা সপ্তপর্ণ-বৃক্ষের শাখায় হিন্দোলা বাঁধিয়াছিল। উল্কা যখন দেখিল মহারাজ সত্যই আসিলেন না, তখন সে বুকের কঞ্চুকী কবরীর মালা ফেলিয়া দিয়া কেশ এলাইয়া সেই হিন্দোলায় গিয়া বসিল। তার পর শুষ্ক চোখে চাঁদের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—"ব্যর্থ! ব্যর্থ! পারিলাম না। এত ছলনা চাতুরী সব মিথ্যা হইল। কোন্ দর্পে তবে মগধে আসিয়াছিলাম? এখন এ লজ্জা কোথায় রাখিব? উঃ—এত নীরস পুরুষরে মন? ধিক্ আমার জীবনে? আমার মৃত্যু ভাল!"

"উল্কা!"

সে ডাকিল? কণ্ঠস্বর শুনিয়া চেনা যায় না। উল্কা গ্রীবা ফিরাইয়া দেখিল, বৃক্ষচ্ছায়ায় এক পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"উল্কা! রাক্ষসি! আমি আসিয়াছি।"

উল্কা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তরুপত্রের ছায়ান্ধকারে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া সে প্রতিহিংসা ভুলিয়া গেল, মগধ ভুলিয়া গেল, বৈশালী ভুলিয়া গেল। দুর্দ্দমনীয় অভিমানের বন্যা তাহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। এমন করিয়াই কি আসিতে হয়? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ম্মূল করিয়া, অভিমান-দর্প ধূলায় মিশাইয়া দিয়াই কি আসিতে হয়? নির্লজ্জার প্রগল্ভ লজ্জাহীনতার কি ইহার বেশী মূল্য নাই?

মহারাজ উল্কার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হস্ত তাহার শ্লথবাস স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষুধিত নয়নে তাহার চক্ষের ভিতর চাহিয়া বলিলেন—"উল্কা, আর পারিলাম না। আমি তোমায় চাই। আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশিয়া গিয়াছ, আমার হৃৎ-স্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হইতেছে—শুনিতে পাইতেছ না? এই শুন।" বলিয়া তিনি উল্কার মুখ নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

অভিমানও ভাসিয়া গেল। এই থরথর ব্যাকুলতার সম্মুখে মান-অভিমান বিলাস-বিভ্রম কিছুই রহিল না; শুধু রহিল চিরন্তন প্রেমলিপ্সু নারীপ্রকৃতি। উল্কা স্ফুরিত অধরোষ্ঠ সেনজিতের দিকে তুলিয়া ধরিয়া স্বপ্ন-বিজড়িত দৃষ্টিতে চাহিল, পাখীর তন্দ্রা-কূজনের ন্যায় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"প্রিয়! প্রিয়তম!—"

মহারাজের তপ্ত অধর বারম্বার তাহার অধরপাত্রে মধু পান করিল। তবু পিপাসা যেন মিটিতে চায় না। শেষে মহারাজ উল্কার কানে কানে বলিলেন,—"উল্কা, সত্য বল, আমাকে ভালবাস? এ তোমার ছলনা নয়?"

উল্কার শিথিল দেহ সুখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল, মহারাজের এই কথায় সে ধীরে ধীরে সেই তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহার মুকুলিত নেত্র উন্মীলিত হইয়া ক্রমে বিস্ফারিত হইল; তার পর মহারাজের বাহু-বন্ধনমধ্যে তাহার দেহ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল।

অভিনয় করিতে করিতে নটীর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে; ছলনা কখন্ সত্যে পরিণত হইয়াছে হতভাগিনী জানিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন? কর্ণমধ্যে সে বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাইল—তুমি বিষকন্যা!

সবলে নিজ দেহ মহারাজের বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল, ত্রাস-বিবৃত চক্ষে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া কথা

বাহির হইল না ; শুধু তাহার কণ্ঠের শিরা দপ্ দপ্ করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মহারাজ দুই বাহু বাড়াইয়া অগ্রসর হইলেন—"প্রাণাধিকে—"

"না না রাজাধিরাজ, আমার কাছে আসিও না"—উল্কা আবার সরিয়া দাঁড়াইল।

মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে মহারাজ বলিলেন—"ছি উল্কা! এই কি ছলনার সময় ?"

উল্কা স্খলিতস্বরে বলিল—"মহারাজ ভুল বুঝিয়াছেন, আমি মহারাজকে ভালবাসি না।"

সেনজিৎ হাসিলেন—"আর মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারিবে না।—এস—কাছে এস।"

ব্যাকুল হৃদয়-ভেদী স্বরে উল্কা কাঁদিয়া উঠিল—"না না—প্রিয়তম, তুমি জানো না—তুমি জানো না—"

সেনজিতের মুখ ম্লান হইল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"বোধ হয় জানি। তুমি বৈশালীর কুহকিনী, আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিলে ; কিন্তু এখন আর তাহাতে কি আসে যায় উল্কা ?"

"কিছু জানো না ; মহারাজ, আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তুমি ফিরিয়া যাও, আর আমার মুখ দেখিও না। মিনতি করিতেছি, তুমি ফিরিয়া যাও।"

তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মহারাজ বিস্ময়ে তাহার দিকে আবার অগ্রসর হইলেন। তখন উল্কা ব্যাধ-ভীতা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া পলাইতে লাগিল : তাহার কণ্ঠ হইতে কেবল উচ্চারিত হইল—"না না না—"

সেনজিৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। উল্কা গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

অধীর ক্রোধে মহারাজ দ্বারে সবেগে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার খুলিল না।

দ্বারে অপরদিক হইতে উল্কা বলিল—"রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণা ধরণীতে আপনার যোগ্যা নারীর অভাব হইবে না। আপনি উল্কাকে ভুলিয়া যান।"

তিক্ত বিকৃতকণ্ঠে মহারাজ বলিলেন—"হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলে?"

মিনতি-কাতরস্বরে উল্কা বলিল—"আর্য্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরিয়া যান—দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।"

"কিন্তু কেন—কেন? কিসের বাধা?"

দ্বারের অপর পার্শ্বে উল্কার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে, তাহা মহারাজ দেখিতে পাইলেন না; শুধু শুনিতে পাইলেন, অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে উল্কা কহিল—"সে কথা বলিবার নয়।"

দন্তে দন্ত চাপিয়া মহারাজ বলিলেন—"কেন বলিবার নয়? তোমাকে বলিতে হইবে, আমি শুনিতে চাই।"

"ক্ষমা করুন।"

"না, আমি শুনিব।"

দীর্ঘ নীরবতার পর উল্কা বলিল—"ভাল, কল্য প্রাতে বলিব।"

মহারাজ দ্বারে মুখ রাখিয়া কহিলেন—"উল্কা, আজিকার এই মধুযামিনী বিফল হইবে?"

"হাঁ মহারাজ।"

যেন বক্ষে আহত হইয়া মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন। ক্লান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ভাল। কল্য প্রভাতেই বলিবে?"

"বলিব।"

"তার পর তুমি আমার হইবে?"

উল্কা নীরব।

মহারাজ বলিলেন—"উল্কা, তুমি কি? তুমি কি নারী নও? আমাকে এমন করিয়া দগ্ধ করিতে তোমার দয়া হয় না?"

উল্কা এবারও নীরব।

অশান্ত হৃদয় লইয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন। উল্কা তখন দ্বারসম্মুখে ভূমিতলে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর নিজ মনে বলিতে লাগিল—"ফিরিয়া গেলেন, মহারাজ ফিরিয়া গেলেন! প্রিয়তম, কেন তোমাকে ভালবাসিলাম? কখন বাসিলাম? যদি বাসিলাম ত আগে জানিতে পারিলাম না কেন? শ্মশানের অগ্নিশিখা আমি, কেমন করিয়া এই অভিশপ্ত দেহ তোমাকে দিব?"

শ্মশানের প্রেত-পিশাচেরা বোধ করি শ্মশান-কন্যার এই অরুন্তুদক্রন্দন শুনিয়া অলক্ষ্যে অট্টহাস্য করিয়া নিঃশব্দে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।

হায় উল্কা, তোমার পাষাণ-হৃদয় পাষাণই থাকিল না কেন? কেন তুমি ভালবাসিলে?

বিনিদ্র রজনীর গ্লানি-অরুণিত-নেত্রে উল্কা শয্যায় উঠিয়া বসিতেই একজন সখী আসিয়া বসিল—"বৈশালী হইতে পত্র আসিয়াছে"—বলিয়া লিপি হস্তে দিল।

জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া ক্লান্ত চক্ষে উল্কা লিপি পড়িল। শিবামিশ্র লিখিয়াছেন—

"কন্যা, চণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি, তোমার মাতৃঋণ শোধ হইল। কিন্তু শিশুনাগবংশ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। স্মরণ রাখিও।"

অন্যমনে পত্র ছিন্ন করিতে করিতে উল্কা পাংশু হাসিয়া বলিল—"সখি, জানিস্, পিতা একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার দেহেও যে শিশু-নাগবংশের রক্ত প্রবাহিত এ কথা তাঁহার স্মরণ নাই।"

সকলে উল্কাকে শিবামিশ্রের কন্যা বলিয়া জানিত, এই রহস্যময় কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সখী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

উল্কা শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল—"ভাল, তাহাই হইবে। শেষ করিতে না পারি, শিশুনাগবংশকে ক্ষীণ করিয়া যাইব।" কল্য রজনী হইতে যে সঙ্কল্প তাহার মনে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, শিবামিশ্রের পত্রে তাহা দৃঢ় হইল।

স্নান সমাপন করিয়া উল্কা যথারীতি বেশভূষা পরিধান করিল। কিন্তু আজ তাহার প্রসাধনে উৎকণ্ঠা নাই, সখীরা যেমন সাজাইয়া দিল তেমনই সাজিল। একবার দর্পণে মুখ দেখিল—দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, তাহার বুকের মধ্যে যে অগ্নি সারা রাত্রি জ্বলিয়াছে, তাহাতে তাহার রূপও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কৈ—দেহে ত তাহার একবিন্দু আঁচ লাগে নাই। বরং নয়নের অলস অরুণ চাহনিতে, গণ্ডের হিমশুভ্র পাণ্ডুরতায়, সর্ব্বাঙ্গের ঈষৎক্লান্ত শিথিলতায় যেন রূপ আরও অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। বিষকন্যাদের বুঝি এমনই হয়, ভিতরের আগুনে রূপের বর্ত্তিকা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

প্রসাধন শেষ হইলে উল্কা একজন সখীকে দুইখানি তরবারি আনিতে আদেশ করিল। সখী বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

তরবারি আসিলে উল্কা তাহাদের কোষমুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিল। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল খরধার অস্ত্র—উল্কা বাহুবল্লরী বিলোলিত করিয়া তাহাদের উর্দ্ধে তুলিল; মনে হইল, যেন কক্ষের ভিতর এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

এতক্ষণে একজন সখী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্রিয় সখি, আমাদের বড ভয় হইতেছে, তরবারি লইয়া কি করিবে ?"

উল্কা অল্প হাসিল—"মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করিব।" তার পর গম্ভীরমুখে বলিল—"আমি উদ্যানে যাইতেছি, তোমরা কেহ সেখানে যাইও না। যদি মহারাজ আসেন, তাঁহাকে বলিও আমি মাধবীকুঞ্জে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" বলিয়া তরবারি হস্তে উদ্যান অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সখীরা ভীতনির্ব্বাক কাষ্ঠপুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

মহারাজ সেনজিৎ মাধবীকুঞ্জের লতাবিতানতলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দুই হস্তে স্থির বিদ্যুতের মত দুইখানি তরবারি লইয়া উল্কা দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চোখে নবীন আষাঢ়ের দলিতাঞ্জন মেঘ, আসন্ন মহাদুর্য্যোগের প্রতীক্ষায় দেহ স্থির।

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন ; উত্তপ্ত আরক্ত চক্ষু তরবারির প্রতি নিবদ্ধ হইল। বলিলেন—"উল্কা, এ কি ?"

উল্কা রক্তাধরে ক্ষীণ হাসিল, বলিল—"এই আমার উত্তর।"

"কিসের উত্তর ?"

"কাল যে কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর।"

সেনজিৎ অধীরপদে উল্কার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্রগর্ভকণ্ঠে বলিলেন—"উল্কা, আজ আবার এ কি নূতন ছলনা ? হৃদয় লইয়া বার বার ক্রীড়া পরিহাস ভাল লাগে না—বল, কাল কেন আমাকে বঞ্চনা করিলে ? আমাদের মিলনে কিসের বাধা ?"

"তাই ত বলিতেছি মহারাজ। আমাদের দু'জনের মধ্যে এই তরবারি ব্যবধান।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ আমাকে অসিযুদ্ধে পরাজিত না করিলে লাভ করিতে পারিবেন না।"

মহারাজ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, বলিলেন—"সে কি ?"

উল্কা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"ইহাই আমার বংশের চিরাচরিত প্রথা।"

এইবার মহারাজের মুখে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল ; মুহূর্ত্তমধ্যে ক্লেশ-চিহ্নিত রেখা অন্তর্হিত হইয়া মুখ আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"এই বাধা !—কিন্তু তুমি নারী, তোমার সহিত অস্ত্র যুদ্ধ করিব কিরূপে ?"

উল্কা গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া চাহিল—"মহারাজ কি আমাকে অস্ত্রবিদ্যায় সমকক্ষ মনে করেন না ?"

সেনজিৎ হাসিলেন, বলিলেন—"তাহা নয়। তোমার অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি, এখনও এ বক্ষ তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত। কিন্তু যদি আমি যুদ্ধ না করি ?"

"তাহা হইলে আমাকে পাইবেন না।"

"যদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি ?"

"তাহাও পারিবেন না, এই তরবারি বাধা দিবে।"

"ভাল—বাধা দিক"—বলিয়া মহারাজ সহাস্যমুখে বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

কম্পিত স্বরে উল্কা বলিল—"মহারাজ, দূরে থাকুন—নচেৎ—" বলিয়া তরবারি তুলিল।

"নচেৎ—?" মহারাজ অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তরবারির অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষস্থল স্পর্শ করিল, তথাপি তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল না। তখন

উল্কা ক্ষিপ্রপদে সরিয়া গিয়া তরবারি নিজ বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিল—"আর অধিক কাছে আসিলে এই অসি নিজ বক্ষে বিঁধিয়া দিব।"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"আমি জানিতাম, তুমি আমার বক্ষে অসি হানিতে পারিবে না—সে জন্য অন্য অস্ত্র আছে—" বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে তিনি উল্কার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইলেন, তাহার বাহু ধরিয়া কপট কঠোর স্বরে বলিলেন—"আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।"

উল্কা কাঁদিয়া বলিল—"নিষ্ঠুর! অত্যাচারী। তোমার কি কলঙ্কের ভয় নাই? অসহায়া নারীর উপর পীড়ন করিতে তোমার লজ্জা হয় না?"

মহারাজ পরিতৃপ্ত হাস্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"না—হয় না। এবার এস, যুদ্ধ করি।" বলিয়া একখানি তরবারি তুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিলেন।

এইবার উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সজল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ কহিলেন—"পাছে তুমি মনে কর, নারীর সহিত যুদ্ধ করিতেও আমি ভয় পাই—তাই অসি ধরিলাম।—এস।" দ্বিতীয় তরবারি তুলিয়া লইয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"কিন্তু উল্কা, যদি সত্যই তোমার হাতে পরাজিত হই? তবে আর তুমি আমার হইবে না?"

উল্কার অধর কাঁপিতে লাগিল, সে উত্তর দিতে পারিল না। মনে মনে বলিল—"আর না, আর না। এত লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারিব না। আমাকে মরিতে হইবে—মরিতে হইবে।—কিম্বা যদি পরাজিত করিতে পারি—পারিব কি?"

অসংযত কণ্ঠস্বর সবলে দৃঢ় করিয়া উল্কা বলিল—"প্রতিজ্ঞা করুন, পরাজিত হইলে আর আমাকে স্পর্শ করিবেন না?"

ঈষৎ গর্ব্বের সহিত সেনজিৎ বলিলেন—"প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি পরাজিত হই কখনও স্ত্রীজাতির মুখ দেখিব না।"

তার পর সেই মাধবীবিতানতলে দুই প্রেমোন্মাদ নরনারীর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুরুষ যুদ্ধ করিল নারীকে লাভ করিবার জন্য, আর নারী যুদ্ধ করিল তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য। উভয়ের হৃদয়েই দুর্দ্দম ভালবাসা, উভয়েই জয়ী হইতে চায়। এরূপ যুদ্ধ জগতে বোধকরি আর কখন হয় নাই।

অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সেনজিৎ দেখিলেন, উল্কার অসি-শিক্ষা অতুলনীয়। তাহার হস্তে ঐ অসিফলক যেন জীবন্ত বিষধরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেনজিৎ সাবধানে সতর্কভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শুধু বিজয়ী হইলে চলিবে না, উল্কার বরতনু অনাহত অক্ষত রাখিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু উল্কার হাত হইতে ঐ বিদ্যুৎশিখাটাকে কাড়িয়া লওয়াও অসম্ভব। তিনি লক্ষ্য করিলেন, উল্কাও অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত তাঁহার দেহে আঘাত না করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে; আঘাত করিবার সুযোগ পাইয়াও আঘাত করিতেছে না। বায়ু-কম্পিত পুষ্পের চারিপাশে লুব্ধ ভ্রমরের মত উল্কার অসি তাঁহার দেহের চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

এই ভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। সেনজিৎ বুঝিলেন, সহজ পন্থায় উল্কাকে পরাজিত করিতে সময় লাগিবে। তাহার দেহে এখনও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না, নিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে বহিতেছে; কেবল নাসাপুট অল্প স্ফুরিত হইতেছে মাত্র। তখন তিনি মনে মনে হাসিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

সহসা যেন অসাবধানতা বশতঃই তাঁহার একটু পদস্খলন হইল। উল্কার

অসির নখ তাঁহার বক্ষের নিকটে আসিয়াছিল, পদস্খলনের ফলে পঞ্জরে একটা আচড় লাগিল। উল্কা সত্রাসে নিশ্বাস টানিল, তাহার তরবারির বিদ্যুৎগতি সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইল। সেই মুহূর্ত্তে মহারাজ সেনজিৎ এক অপূর্ব্ব কৌশলে দেখাইলেন, তাঁহার অসি উল্কার অসির সঙ্গে যেন জড়াইয়া গেল, তার পর তিনি ঊর্দ্ধদিকে একটু চাপ দিলেন। অমনি উল্কার হস্তমুক্ত অসি উড়িয়া দূরে পড়িল।

মহারাজ বলিলেন—"কেমন, হইয়াছে?"

বিস্ময়-বিমূঢ় মুখে সভয়ে দ্রুতস্পন্দিতবক্ষে উল্কা চাহিয়া রহিল; তারপর থরথর-দেহে কাঁপিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এক দিকে নিজ দেহ-মন প্রিয়তমের বুকের উপর নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা, অপর দিকে প্রিয়তমের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবার বাসনা—অন্তরের মধ্যে এই সুরাসুর দ্বন্দ্ব যখন চলিতে থাকে, তখন নারীর কাঁদিবার শক্তিও আর থাকে না। তখন গর্ব্ব ও দীনতা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্য, চরম ব্যর্থতা ও পরম সিদ্ধি এক সঙ্গে মিশিয়া প্রেম-নির্ম্মথিত নারীচিত্তে যে হলাহল উত্থিত হয়, তাহা বোধ করি এ জগতের বিষকন্যারাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

উল্কা দুই বাহুতে ভর দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। সেনজিৎ তরবারি ফেলিয়া তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিলেন, পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া স্নেহ-ক্ষরিত কণ্ঠে বলিলেন—"উল্কা, আর ত বাধা নাই।"

শুষ্ক চক্ষু তুলিয়া উল্কা বলিল—"না, আর বাধা নাই।"

দীর্ঘকাল সে অপলক দৃষ্টিতে মহারাজের মুখ নিরীক্ষণ করিল, যেন রাক্ষসীর মত তাঁহার প্রতি অবয়ব দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিল। মহারাজও মুগ্ধ তন্ময় হইয়া উল্কাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল—বক্ষে রোমাঞ্চ। তিনি ভাবিলেন—"প্রেম এত মধুর! এত

দিন জানিতাম না, উল্কা, তুমি আমাকে ভালবাসিতে শিখাইলে! উল্কা—প্রেয়সী—"

উল্কার চোখের দৃষ্টিতে যে কত কি ছিল, মহারাজ তাহা দেখিতে পাইলেন না। উল্কা তখন ভাবিতেছিল—পাইলাম না—পাইলাম না! প্রিয়তম, তোমাকে পাইয়াও পাইলাম না!

কুঞ্জ-বাহিরে উৎকণ্ঠিতা সখীর কঙ্কণধ্বনি শুনিয়া দু'জনের বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল। উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল; চোখ দুটি মহারাজের মুখের উপর পাতিয়া একটু হাসিল। তার পর অনুচ্চ অতি অস্ফুট স্বরে বলিল—"আজ নিশীথে বাসকগৃহে আমি মহারাজের প্রতীক্ষা করিব।"

দীপের তৈল ফুরাইয়া আসিতেছে; আকাশে চন্দ্রও ক্ষয়িষ্ণু। বিষকন্যা উল্কার বিষদিগ্ধ কাহিনী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

নিশীথ প্রহরে মহারাজ আসিলেন। উল্কা পুষ্প-বিকীর্ণ বাসক-গৃহের মধ্যস্থলে একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হস্তে এক গুচ্ছ কমল-কোরক।

সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া লইলেন। কমল-কোরকের গুচ্ছ উভয়ের বক্ষের মাঝখানে রহিল।

"উল্কা—প্রাণময়ি—" বিপুল আবেগে উল্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন—আনন্দ-বেদনা

উল্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল—"প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনিভাবে আমায় মরিতে দাও।"

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণ মিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি ঝরিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ

ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ-নিষ্পেষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সেনজিৎ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"উল্কা! সর্ব্বনাশী! এ কি করিলি?"

উল্কা তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অনির্ব্বচনীয় হাসি হাসিল, বলিল—"এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা। প্রিয়তম, আরও কাছে এস, তোমাকে ভাল দেখিতে পাইতেছি না।"

সেনজিৎ তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"কিন্তু কেন—কেন উল্কা? কেন এমন করিলে?"

উল্কার মুখের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল;—সে অতি ক্ষীণ নির্ব্বাপিত স্বরে বলিল—"প্রাণাধিক, আমি বিষকন্যা—"

* * * *

সেবারে শিবামিশ্রের প্রতিহিংসা পূর্ণ সফলতা লাভ করিল না। সার্দ্ধ শত বৎসর পরে আর একজন কুটিল ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

বহুদূর অতীতের এই বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি—এই জাতিস্মর—কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করি নাই, করিবার প্রয়োজনও নাই। হয় ত বিদূষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, হয় ত রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়াছিলাম, কিংবা হয় ত শৃগালের দংষ্ট্রাক্ষত গণ্ডে বহন করিয়াছিলাম। পাঠক যেরূপ ইচ্ছা অনুমান করুন, আমি আপত্তি করিব না।

শুধু একটা প্রশ্ন এই সংস্কার-বর্জ্জিত বিংশ শতাব্দীতে বসিয়া মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়। উল্কা যদি প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বিষকন্যাই ছিল, তবে সেনজিৎ না মরিয়া সে নিজে মরিল কেন?

প্রাগ্‌জ্যোতিষ

১

আর্য্য দ্রাবিড় হূণ মোঙ্গল—প্রত্যেক মৌলিক জাতির জীবনেই একটা সময় আসে যেটাকে তাহার নবীন যৌবন বলা চলে; যখন তপ্ত যৌবনের দুর্দ্দমনীয় অপরিণামদর্শিতায় তাহারা বহু অসম্ভব ও হাস্যকর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়ে।

যাহাদের আমরা আর্য্যজাতি বলিয়া জানি, তাহাদের জীবনে এই নবীন যৌবন আসিয়াছিল বোধ হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরও আগে। পাঁজিপুঁথি তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই; আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য স্বেচ্ছামত নিশ্চিন্ত মনে স্ব-স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিত—মানুষ তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে আরম্ভ করে নাই।

আর্য্য বীরপুরুষগণ ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া আদিম অনার্য্যদিগকে বিন্ধ্যাচলের পরপারে খেদাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু তাহাদের রাক্ষস পিশাচ দস্যু প্রভৃতি নাম দিয়া কটূক্তি করিতেছিলেন। মনে হয়, সে-যুগেও শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাইবার প্রথা পুরাদস্তুর প্রচলিত ছিল।

তারপর একদা অগস্ত্য মুনি কতিপয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দক্ষিণাপথে অগস্ত্যযাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। রাক্ষস ও পিশাচগণ তাঁহাকে কাঁচা ভক্ষণ করিল কিনা পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। যা হোক, তদবধি অন্যান্য আর্য্য বীরগণও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দুইজন নবীন আর্য্য যোদ্ধা সৈন্যসামন্ত লইয়া দক্ষিণাপথে বহুদূর অগ্রসর

হইয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিয়া-শুনিয়া খানিকটা উর্ব্বর ভূভাগ হইতে কৃষ্ণকায় দস্যু-তস্করদের তাড়াইয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য্য বীরপুরুষ দুটির নাম—প্রদ্যুম্ন এবং মঘবা। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।

আজকাল বন্ধুত্ব বস্তুটার তেমন তেজ নাই; ইয়ারকি দিবার জন্যই বন্ধুকে প্রয়োজন হয়। সেকালে দস্যু ও রাক্ষস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বন্ধুত্ব পুরামাত্রায় বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইত।

দুই বন্ধুর যৌথ বাহুবলে রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—রাজা হইবে কে?

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'মঘবা, তুই রাজা হ, আমি সেনাপতি হইব।'

মঘবা কহিলেন, 'উঁহু, তুই রাজা হ—আমি সেনাপতি।'

সমস্যার সমাধান হইল না; বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া রাজা হইতে কেহই ব্যগ্র নয়। এদিকে নবলব্ধ রাজ্যটি এতই ক্ষুদ্র যে ভাগাভাগি করিতে গেলে কিছুই থাকে না, চটকস্য মাংসং হইয়া যায়। প্রজা ভাগাভাগি করিলেও শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য—চারিদিকে শত্রু ওৎ পাতিয়া আছে। বন্ধুযুগল বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন রাত্রিকালে আকাশে গোলাকৃতি চন্দ্র শোভা পাইতেছিল—অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রি। প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ দুর্গের চূড়ায় দুই বন্ধু চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গটা অবশ্য বিতাড়িত অনার্য্য দস্যুদের নির্ম্মিত; আর্য্যেরা আদৌ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না। রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণের দুর্গ দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন।

মঘবা তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ দাড়ির মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মুক্ত ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। প্রকাণ্ড ষণ্ডা চেহারা, নীল চক্ষু; মুদ্‌গরের মত দৃঢ় ও নিরেট দেহ। চিন্তা করার অভ্যাস তাঁহার

বিশেষ ছিল না, তাই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলেই তিনি নিজের দাড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতেন।

প্রদ্যুম্নের চেহারাখানা অপেক্ষাকৃত লঘু কিন্তু সমধিক নিরেট ও দৃঢ়। মাথায় সোনালি চুল, চোখের মণি গাঢ় নীল। দাড়ি নাই ; গলা চুলকাইত বলিয়া তিনি তরবারির অগ্রভাগ দিয়া দাড়ি কামাইয়া ফেলিতেন। কেবল এক জোড়া সূক্ষ্ম গোঁফ ছিল। এই গোঁফে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে প্রদ্যুম্ন প্রাচীর-বেষ্টনীতে ঠেস দিয়া চাঁদের পানে ভ্রূকুটি করিতেছিলেন।

চাঁদ কিন্তু হাসিতেছিল। তাহার যে গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে, পঞ্জিকা না থাকায় সে তার পূর্ব্বাভাস পায় নাই।

সহসা মঘবা বলিলেন, 'একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে। প্রদ্যুম্ন, আয় পাঞ্জা লড়ি—যে হারিবে তাহাকেই রাজা হইতে হইবে।'

প্রদ্যুম্ন গোঁফের আড়ালে শ্লেষ হাস্য করিলেন, 'জুচ্চুরির মতলব। গত যুদ্ধে আমার কব্জি মচকাইয়া গিয়াছে জানিস কি না!'

ব্যর্থ হইয়া মঘবা আবার দাড়ি টানিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে দোষ কি?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে কে কাহার হুকুম মানিবে? কে প্রজাদের হুকুম দিবে?'

'তা বটে।'

'তবে দু-জনে রাজা হওয়া যায়। পর পর।'

'সে কি রকম?'

'তুই কিছুদিন রাজা হইলি, আমি সেনাপতি। তারপর আমি রাজা হইলাম। এই আর কি।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। একদিন তুই রাজা এক-দিন আমি।'

'উহুঁ, অত তাড়াতাড়ি রাজা বদল করিলে গণ্ডগোল বাধিবে।'

'গণ্ডগোল কিসের?'

'মনে কর, আমি রাজা হইয়া তোকে হুকুম দিলাম—সেনাপতি, শুনিয়াছি দক্ষিণে লম্বোদর নামক রাক্ষসদের রাজ্যে রসাল নামক এক প্রকার অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তুমি দ্রুত গিয়া ঐ ফল আহরণ করিয়া আন, আমার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।—তুই ফল লইয়া ফিরিতে ফিরিতে দিন কাবার হইয়া গেল, তুই রাজা হইলি আমি সেনাপতি বনিয়া গেলাম। তখন কে ফল খাইবে?'

মঘবা বলিলেন, 'তাই ত। বড়ই ফ্যাসাদ দেখিতেছি।'

মনে রাখিতে হইবে, আর্য্যগণ তখনও স্থির হইয়া বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন নাই; দু-একজন ঋষি হঠাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ এক-আধটা সূত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলিতেন এই পর্য্যন্ত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এইরূপ ঋতুপরিবর্ত্তনের কথা মোটামুটি জানা থাকিলেও, সময়কে সপ্তাহ মাস বৎসরে বিভাজিত করিবার বুদ্ধি তখনও গজায় নাই।

সুতরাং প্রদ্যুম্ন ও মঘবা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন।

ওদিকে আকাশে চন্দ্রও ফাঁপরে পড়িয়াছিল। প্রদ্যুম্ন তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিবার জন্য চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে আরে, একি!'

মঘবাও দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলেন। দেখিলেন, আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

দুই বন্ধুর মনে সশঙ্ক উত্তেজনার উৎপত্তি হইল। ব্যাপারটা পূর্ব্বে কয়েক বার দেখা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা প্রাকৃতিক ঘটনা

বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই, ভূকম্পের মত অপ্রত্যাশিত একটা মহাদুর্যোগ বলিয়াই বিবেচিত হইত। মঘবা দ্রুত আসিয়া প্রদ্যুম্নের হাত চাপিয়া ধরিলেন, গাঢ় স্বরে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ!'

প্রদ্যুম্ন পাংশুমুখে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু ভয় নাই। চাঁদ আবার মুক্ত হইবে।—ছেলেবেলায় বুড়া অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিদ্যা শিখিতে কয়েক বার গিয়াছিলাম, বুড়া এক দিন বলিয়াছিল আকাশে রাহু নামে একটা অদৃশ্য রাক্ষস আছে, সে মাঝে মাঝে চন্দ্র-সূর্য্যকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না।'

'হাঁ, আমিও চার-পাঁচ বার দেখিয়াছি।'

'আমিও। মাঝে মাঝে এরূপ ঘটিয়া থাকে।'

দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, বিপন্ন ম্রিয়মাণ চন্দ্র যেন একটা তাম্রবর্ণ অর্দ্ধস্বচ্ছ অজগরের পেটের ভিতর দিয়া পশ্চাদভিমুখে চলিয়াছে। দুর্গের নিম্নে ভয়ার্ত্ত জনগণ সমবেত হইয়া চীৎকার ও নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। দুষ্ট রাক্ষসগণ নাকি এইরূপ বিকট শব্দ শুনিলে ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

দীর্ঘকাল পরে চাঁদের একটি চকচকে কোণ বাহির হইয়া পড়িল। তার পর দেখিতে দেখিতে চন্দ্র সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে সহাস্য মুখে রাক্ষসের কবল হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন।

সকলে উর্দ্ধস্বরে মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মঘবা প্রদ্যুম্নের হাত ছাড়িয়া দিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্যারও সমাধান হইয়াছে।'

'কিরূপ?'

'শুন। আজ হইতে তুমি রাজা হইলে। আবার যখন চন্দ্রে গ্রহণ

লাগিবে তখন তোমার রাজত্বকাল শেষ হইবে, আমি রাজা হইব। এই ভাবে চলিতে থাকিবে।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়।—কিন্তু প্রথমেই আমি রাজা হইব কেন?'

'যেহেতু বুদ্ধিটা আমি বাহির করিয়াছি। এখন চলিলাম, কাল সকালে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব—সেনাপতির আর কাজ কি? মহারাজ ইতিমধ্যে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকুন। মহারাজের জয় হোক।'

মুচকি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গশিখর হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন। মঘবা অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িয়া নিজের দাড়ি টানিতে লাগিলেন।

মঘবার মাথায় বড় বেশী বুদ্ধি খেলে না, কিন্তু এখন সহসা তাঁহার মস্তিষ্করন্ধ্রে রাজবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, 'সেনাপতি প্রদ্যুম্ন।'

প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিয়া জোড়করে দাঁড়াইলেন।

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

মহারাজ মঘবা মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, 'আজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রাতে আমি সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরি, তুমি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এবার আমি রাজশয্যায় শয়ন করিতে চলিলাম।'

মুচকি হাসি হাসিতে মঘবা অভ্যস্ত নহেন, প্রদ্যুম্নের প্রতি একবার চোখ টিপিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বোকা বনিয়া গিয়া প্রদ্যুম্ন বামকর্ণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

২

নবযৌবনের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, সে জীবনটাকে গাম্ভীর্য্যের চশমার ভিতর দিয়া দেখে না ; জগৎ তাহার কাছে খেলার মাঠ ; যুদ্ধ একটা সরস কৌতুক ; প্রেম একটা মাদক উত্তেজনা।

মহারাজ মঘবা মহানন্দে অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে কোদণ্ড নামে এক অনার্য্য জাতি আছে, উদ্দেশ্য তাহাদের উৎপীড়ন করা।

আধুনিক গণনায় যে-সময়টাকে তিন মাস বলা চলে, অনুমান তত দিন পরে মঘবা যুদ্ধযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিঙ্গল কেশ রুক্ষ, দেহে পশুচর্ম্মের আবরণ ছিন্নভিন্ন, মুখে পরিতৃপ্ত বাসনার হাসি।

আসিয়াই তিনি প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে বজ্রসম চপেটাঘাত করিলেন। বলিলেন, 'কি রে কেমন আছিস্?'

দুই বন্ধু নিবিড় ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'রোগা হইয়া গিয়াছিস্ দেখিতেছি ; রাক্ষসদের মুল্লুকে কিছু খাইতে পাস নাই বুঝি?' তার পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজের জয় হউক। আর্য্যের সমস্ত সংবাদ শুভ?'

মঘবা বলিলেন, 'মন্দ নয়। কোদণ্ড বেটাদের খুব ঠুকিয়াছি। শুধু তাই নয়, একটা মজার জিনিষ আনিয়াছি, দেখাইব চল।'

বিজিত জাতির নিকট হইতে অপহৃত বহু বিচিত্র বস্তু এক দল সৈনিকের রক্ষণায় ছিল, মঘবা তাহাদের ইঙ্গিত করিয়া রাজভবন অভি-মুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার পর, রাজ্য কেমন চলিতেছে? প্রজারা আনন্দে আছে?'

'প্রজাদের আনন্দ সম্প্রতি বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে।'

'কিরূপ?'

'আর্য্য যোদ্ধ্‌গণের প্রাণে রসের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা অনার্য্য মেয়ে ধরিয়া আনিয়া পটাপট বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে।'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, 'তাই নাকি?—রোগ ছোঁয়াচে দেখিতেছি।'

প্রদ্যুম্ন মঘবার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিলেন। মঘবা বলিলেন, 'কিন্তু উপায় কি? এই দেশেই যখন বসবাস করিতে হইবে, তখন আর্য্য রক্ত নিষ্কলুষ রাখা অসম্ভব। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এত মেয়ে আমদানি করা চলে না, অথচ বংশরক্ষাও না করিলে নয়। এই যে রাজ্য জয় করিলাম—কাহাদের জন্যে?'

প্রদ্যুম্ন শুধু বলিলেন, 'হুঁ।'

রাজা ও সেনাপতি মন্ত্রগৃহে গিয়া বসিলেন। সামন্ত সচিব শ্রেষ্ঠী বিদূষক কিছুই নাই, সুতরাং মন্ত্রণাগৃহ শূন্য। চারি জন সৈনিক একটা বৃহৎ বেত্র-নির্ম্মিত পেটারি ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। পেটারির মুখ ঢাকা, ভিতরে গুরুভার কোনও দ্রব্য আছে মনে হয়।

বিস্মিত প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কি আছে ইহার মধ্যে? অজগর সাপ নাকি?'

মঘবা হস্তসঞ্চালনে সৈনিকদের বিদায় করিয়া হাসিতে হাসিতে পেটারির ঢাকা খুলিয়া দিলেন।

সাপুড়ের ঝাঁপি খোলা পাইয়া কৃষ্ণকায় সর্পা যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনই একটি নারী পেটারির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীলাঞ্জন চোখে ধিকি ধিকি বিদ্যুৎ।

প্রদ্যুম্ন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যাদিত মুখ হইতে বাহির হইল, 'আরে একি! এ যে একটি মেয়ে।'

মঘবা অট্টহাস্য করিলেন; তার পর বলিলেন, 'কেমন মেয়ে? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন নীরবে বন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন। মার্জ্জিত তাম্রফলকের ন্যায় দেহের বর্ণ; দলিতাঞ্জন দুটি চোখ, দলিতাঞ্জন চুল। বস্ত্র-অলঙ্কারের বাহুল্য নাই; গলায় একটি বীজের মালা, বাহুতে শঙ্খের অঙ্গদ; কবরী ও কর্ণে পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত একটি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পট্টাংশু। কৃশাঙ্গী যুবতীর যৌবন-মেদুর দেহের অভ্যন্তর হইতে যেন কৃশানুর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মঘবা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হয়? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন চমকিয়া মঘবার দিকে ফিরিলেন, তার পর ভর্ৎসনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুই একটা আস্ত গোঁয়ার। যুদ্ধ করিতে গিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিলি। এখন ইহাকে লইয়া কি করিবি?'

ইহাকে দিয়া যে দাসীকিঙ্করীর কাজ চলিবে না তাহা এক বার দৃষ্টি করিয়াই আর সংশয় থাকে না।

মঘবা বলিলেন, 'ঠিক করিয়াছি বিবাহ করিব।'

প্রদ্যুম্ন সচকিতে বলিলেন, 'বিবাহ!'

'হাঁ। ও কে জানিস্? কোদণ্ডরাজার মেয়ে।'

প্রদ্যুম্নের মুখ সহসা গম্ভীর হইল। মঘবা বলিতে লাগিলেন, 'কোদণ্ড-দের রাজপুরী দখল করিয়া দেখিলাম সকলে পলাইয়াছে, কেবল মেয়েটা একা দাঁড়াইয়া আছে। ভারি ভাল লাগিল। ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তাই পেটারি বন্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি। আর্য্য রাজার মহিষী হইবার যোগ্য মেয়ে বটে; কিন্তু

উহাকে আগে আর্য্য ভাষা শিখাইতে হইবে। তার পর আমার পট্টমহিষী করিব।'

প্রদ্যুম্ন আর একবার যুবতীর পানে ফিরিয়া দেখিলেন। সে তাহাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কেবল তাহার চোখদুটি একের মুখ হইতে অন্যের মুখে যাতায়াত করিতেছে। তাহার মুখে ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন কিছুই নাই; আছে কেবল এই বর্ব্বরদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ গর্ব্বিত জিজ্ঞাসা।

ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রদ্যুম্ন মঘবার দিকে ফিরিলেন, 'অন্যায় করেছ মঘবা। হাজার হোক রাজার মেয়ে, তাহাকে এ ভাবে ধরিয়া আনা আর্য্য শিষ্টতা হয় নাই।'

মঘবা বলিলেন, 'বিবাহ করিবার জন্য কন্যা হরণ করিলে আর্য্য শিষ্টতা লঙ্ঘন হয় না।'

'হয়। অরক্ষিতা মেয়েকে ধরিয়া আনা তস্করের কাজ। এই দণ্ডে এই কন্যাকে ফেরত পাঠানো উচিত।'

তপ্তকণ্ঠে মঘবা বলিলেন, 'কখনই না—' তার পর আত্মসম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন, 'আমি মহারাজ মঘবা, তোমাকে আদেশ করিতেছি, সেনাপতি প্রদ্যুম্ন, তুমি এই কন্যার যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা কর—যাহাতে সুখে থাকে অথচ পলাইতে না পারে।—মনে থাকে যেন, কন্যা পলাইলে দায়িত্ব তোমার।'

প্রদ্যুম্ন একবার কয়েকমুহূর্ত্তের জন্য বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর যুক্তকরে মস্তক অবনত করিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, 'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

দুর্গচূড়ার কূটকক্ষে ভাবী রাজমহিষীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কোদণ্ড-কন্যা দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অকম্পিত পদে দুর্গ-শীর্ষের কারাগারে

প্রবেশ করিলেন। কার্য্যতঃ কারাগার হইলেও স্থানটি প্রশস্ত অলিন্দযুক্ত একটি মহল। সকল সুবিধাই আছে, শুধু পলাইবার অসুবিধা।

মঘবা সহর্ষে প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'রাণীর মত রাণী পাওয়া গিয়াছে—কি বলিস্?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'হুঁ।'

৩

পরদিন প্রাতঃকালে কিন্তু গুরুতর সংবাদ আসিল। কোদণ্ডদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত নিরতিশয় নির্জ্জীব একটি ভগ্নদূত জানাইল যে, রাজকন্যা-হরণের কথা জানিতে পারিয়া পলাতক কোদণ্ড জাতি আবার কাতারে কাতারে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মঘবা যে অল্পসংখ্যক আর্য্যকটক থানা দিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শত্রুর অতর্কিত ক্ষিপ্রতায় তাহারা কচুকাটা হইয়াছে—কেবল ভগ্নদূত পদদ্বয়ের অসাধারণ ক্ষিপ্রতাবশত প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। পরিস্থিতি অতিশয় ভয়াবহ।

শুনিয়া প্রদ্যুম্ন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, অনুমতি দিন শ্যালক-দের টিট করিয়া আসি।'

মঘবা কিন্তু রাজী হইলেন না, বলিলেন, 'তাহা হয় না। টিট করিতে হয় আমি করিব।'

সৈন্য সাজাইয়া আবার মঘবা বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যুম্নকে বলিলেন, 'ইতিমধ্যে মেয়েটাকে তুই আর্য্যভাষা শেখাস্।'

মনের ক্ষুব্ধতা গোপন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আচ্ছা।'

* * * *

দু'এক দিনের মধ্যেই প্রদ্যুম্ন বুঝিতে পারিলেন, অনার্য্য মেয়েটি অতিশয় মেধাবিনী। অষ্টাহমধ্যে সে ভাঙা ভাঙা কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

তাহার নাম এলা। অনার্য্য নাম বটে, কিন্তু শুনিতে ও বলিতে বড় মিষ্ট। প্রদ্যুম্ন কয়েক বার উচ্চারণ করিলেন, 'এলা! এলা! বাঃ! বেশ ত।'

কথা কহিতে শিখিয়াই এলা প্রথম প্রশ্ন করিল, 'ও লোকটা কে? যে আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আমার বন্ধু।'

বন্ধু শব্দের ভাবার্থ বুঝিতে এলার কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে বুঝিতে পারিয়া সে নাক সিঁটকাইল; তীব্র অবজ্ঞার কণ্ঠে বলিল, 'তোমরা বর্ব্বর।'

প্রদ্যুম্ন অবাক হইয়া গেলেন।—ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমরা বর্ব্বর!

ক্রমশ এলা আর্য্যভাষায় কথা কহিতে লাগিল—কোনও কথা বলিতে বা বুঝিতে তাহার বাধে না। এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছ কেন?'

প্রদ্যুম্ন ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'আর্য্যভাষা শিখাইবার জন্য।'

এলা বলিল, 'ছাই ভাষা। ইহা শিখিয়া কি হইবে?'

প্রদ্যুম্ন একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'প্রেমালাপ করিবার সুবিধা হইবে। মহারাজ মঘবা তোমাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।'

এলা বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে প্রদ্যুম্নের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর আবার বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত স্বরে বলিল, 'উহাকে আমি বিবাহ করিব না। বর্ব্বর!'

প্রদ্যুম্ন স্তোক দিবার জন্য বলিলেন, 'মঘবা দাড়ি রাখে বটে কিন্তু লোক খারাপ নয়—'

এলা শুধু বলিল, 'বর্ব্বর!'

এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু মঘবার দেখা নাই—তিনি কোদণ্ডদের টিট করিলেন অথবা কোদণ্ডেরা তাঁহাকে টিট করিল, কোনও সংবাদ নাই। প্রদ্যুম্ন উতলা হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্ন এলার কূটগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এলা বাতায়ান-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেণী উন্মোচন করিতেছে। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইল, তার পর আবার বাহিরের দূর দৃশ্যের পানে তাকাইয়া বেণীর বিসর্পিল বয়ন মোচন করিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন গলা ঝাড়া দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন তিনি বাতায়ন-সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; আকাশের দিকে তাকাইলেন, নিম্নে উঁকিঝুঁকি মারিলেন, তার পর পুনশ্চ গলাখাকারি দিয়া বলিলেন, 'শীত আর নাই; দিব্য গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।'

এলা বলিল, 'হুঁ।'

উৎসাহ পাইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আজকাল দক্ষিণ হইতে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাকেই বুঝি তোমরা মলয় সমীরণ বলিয়া থাক? আর্য্যাবর্ত্তে এ হাওয়া নাই।'

এলা তাঁহার দিকে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'দু-দিন আসা হয় নাই কেন?'

প্রদ্যুম্ন থতমত খাইয়া বলিলেন, 'ব্যস্ত ছিলাম',—একটু থামিয়া—'তোমার তো আর আর্য্যভাষা শিখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই আমাদের সকলের কান কাটিয়া লইতে পার।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না ; এলা নতনেত্রে মুক্ত বেণী আবার বিনাইতে লাগিল। শেষে প্রদ্যুম্ন পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মঘবা আসিয়া পড়িলে বাঁচা যায়। অনেক দিন হইয়া গেল, এখনও তাহার কোনও খবর নাই।—দুর্ভাবনা হইতেছে।'

এলা তিলমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া নির্দ্দয়ভাবে হাসিল, বলিল, 'তোমার মঘবা আর ফিরিবে না, আমার স্বজাতিরা তাহাকে শেষ করিয়াছে।'

ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'মঘবাকে শেষ করিতে পারে এমন মানুষ দাক্ষিণাত্যে নাই। সে মহাবীর।'

তাচ্ছিল্যভরে এলা বলিল, 'বর্ব্বর।'

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'ঐ বর্ব্বরকেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া এলা বলিল, 'তাই নাকি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'তুমি তো বন্দিনী। তোমার আবার ইচ্ছা কি?'

প্রত্যেকটি শব্দ কাটিয়া কাটিয়া এলা উত্তর দিল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিবাহ করিতে পারে এমন পুরুষ তোমাদের আর্য্যাবর্ত্তে জন্মে নাই।—এই বীজের মালা দেখিতেছ?' এলা দুই আঙ্গুলে নিজ কণ্ঠের বীজমালা তুলিয়া দেখাইল, 'একটি বীজ দাঁতে চিবাইতে যেটুকু দেরি—আর আমাকে পাইবে না।'

প্রদ্যুম্ন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ—বিষ!—দাও, শীঘ্র মালা আমায় দাও।'

এলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, 'এত দিন তোমাদের বন্দিনী হইয়া আছি, ভাবিয়াছ আমি অসহায়া? তোমাদের খেলার পুতুল? তাহা নহে। যখন ইচ্ছা আমি মুক্তি লইতে পারি।'

প্রদ্যুম্ন মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তবে লও নাই কেন?'

এলা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল; তার পর গর্ব্বিত স্বরে বলিল, 'সে আমার ইচ্ছা।'

এই সময় বাতায়নের বাহিরে দূর উপত্যকায় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ হইল। চমকিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সীমান্তের বনানীর ভিতর হইতে ধ্বজকেতনধারী আর্য্যসেনা ফিরিয়া আসিতেছে। ললাটের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, যাক, বাঁচা গেল—মঘবা ফিরিয়াছে!'

প্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। পিছন হইতে এলার শান্ত কণ্ঠস্বর আসিল, 'আমিও বাঁচিলাম, মুক্তির আর দেরি নাই।'

প্রদ্যুম্ন চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এলা তেমনি দাঁড়াইয়া বেণী বয়ন করিতেছে, তাহার মুখে সূচীবিদ্ধ মৃত প্রজাপতির মত একটুখানি হাসি।

প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে ফিরিয়া গিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলিলেন, 'এলা, ছেলেমানুষি করিও না। মঘবাকে বুঝিতে সময় লাগে, বিবাহের পর বুঝিতে পারিবে তাহার মত মানুষ হয় না—মিনতি করিতেছি, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিও না।'

এলা বলিল, 'হঠাৎ কোনও কাজ করা আমার অভ্যাস নয়; আমি কোদণ্ড-কন্যা, বর্ব্বর নহি। যদি মঘবা বলপূর্ব্বক আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করে, বিবাহের সভায় আমি মুক্তি লইব।'

৪

মঘবা বলিলেন, 'কোদণ্ডদের ভাল রকম কাবু করিতে পারিলাম না। ক্ষেপিয়া গেলে ব্যাটারা ভীষণ লড়ে। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত সন্ধি করিয়াছে।'

প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিলেন, 'সন্ধির সর্ত্ত কিরূপ?'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন, 'চমৎকার। অদ্ভুত জাত এই কোদণ্ড, আশ্চর্য্য তাহাদের রীতিনীতি।—জানিস্ ওদের জাতে মেয়ে বাপের উত্তরাধিকারিণী হয়, ছেলে মামার সম্পত্তি পায়! শুনিয়াছিস্ কখনও?'

মাথা নাড়িয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'না। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত কিরূপ?'

'সর্ত্ত এই—কোদণ্ডের রাজকন্যা অপহরণ করাতে তাহাদের মর্য্যাদায় বড় আঘাত লাগিয়াছে; এই কলঙ্ক-মোচনের একমাত্র উপায় কন্যাকে বিবাহ করা। বিবাহ না করিলে তাহারা যুদ্ধ করিবে, কিছুতেই শুনিবে না। আর যদি বিবাহ করি, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে কোদণ্ডদের রাজা হইব। গুরুতর সর্ত্ত নয়?' বলিয়া মঘবা গলা ছাড়িয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রদ্যুম্ন কিয়ৎকাল হেঁটমুখে রহিলেন, তার পর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'গুরুতর বটে।'

মঘবা বলিলেন, 'সুতরাং আর বিলম্ব নয়, তাড়াতাড়ি কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলা দরকার।—মেয়েটা ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

'আর্য্যভাষা কেমন শিখিল?'

'বেশ।'

'তবে কালই বিবাহ করিব।'

কিছু কাল নীরব থাকিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কন্যার মতামত জানিবার প্রয়োজন নাই ?'

'কিছুমাত্র না। এ রাজকীয় ব্যাপার, কথার নড়চড় চলিবে না। সন্ধির সর্ত্ত পালন করিতেই হইবে।'

* * * *

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন চোরের মত এলার মহলে প্রবেশ করিলেন। আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চন্দ্র গবাক্ষপথে কিরণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে ; সেই জ্যোৎস্নার তলে মাটিতে পড়িয়া এলা ঘুমাইতেছে। ঘরে প্রদীপ নাই।

নিঃশব্দে প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে গেলেন ; হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন ; নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

এলা ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহার চক্ষের কোণ বাহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বপ্নে এলা গদ্‌গদ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—'প্রদ্যুম্ন ! প্রদ্যুম্ন ! প্রদ্যুম্ন !···আমি মরিতে চাহি না···তুমি কেমন মানুষ··· কিছু বুঝিতে পার না ?···বর্ব্বর !···আমাকে উদ্ধার কর···প্রদ্যুম্ন ! প্রদ্যুম্ন···

যে-কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করা হইল না, বীজের মালা এলার কণ্ঠেই রহিল। প্রদ্যুম্ন চোরের মত নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। মঘবা রাত্রির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, 'প্রদ্যুম্ন, এবার বিবাহের আয়োজন কর।'

রাজভবনের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধুনীর মত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইবে। হোমাগ্নির পুরোভাগে বরবধূর কাষ্ঠাসন-পীঠিকা সন্নিবেশিত হইল।

বিবাহের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই প্রচারিত হইয়াছিল; উৎসুক জনমণ্ডলী প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল।

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্ন একদৃষ্টে অগ্নির পানে তাকাইয়া আছেন; একবার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মঘবা আসিয়া স্কন্ধে হাত রাখিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, অগ্নি হইতে চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। সম্মুখেই চন্দ্র; বৃক্ষশাখার অন্তরাল ছাড়াইয়া এইমাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রদ্যুম্ন সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঘবা বলিলেন, 'রাত্রি হইয়াছে, বিবাহের সময় উপস্থিত। তুই এবার গিয়া বধূকে লইয়া আয়।'

প্রদ্যুম্ন ধীরে ধীরে মঘবার দিকে ফিরিলেন; গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা!'

মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন! রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁহার প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তার পর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই চাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্মেঘ কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা, আমি বধূকে আনিতে যাইতেছি; সন্ধির সর্ত্ত রক্ষার জন্য আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। ইতিমধ্যে তুমি প্রজামণ্ডলকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দাও।'

মঘবা কিয়ৎকাল স্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তার পর তাঁহার প্রচণ্ড অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সহসা হাস্য থামাইয়া মঘবা করজোড়ে বলিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।'

এলা বাতায়নের পাশে বসিয়া ছিল, প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমাকে লইতে আসিয়াছ?'

'হাঁ রাজকুমারী। কোদণ্ডদের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়াছে; তাহার সর্ত্ত এই যে, আর্য্যরাজা কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিবেন। আমরা ধর্ম্মতঃ এই সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য।'

'আর কিছু বলিবার আছে?'

'সামান্য। ঘটনাক্রমে আমি এখন আর্য্যরাজা, মঘবা আমার সেনাপতি। সুতরাং বিবাহ করিতে হইলে আমাকেই বিবাহ করিতে হইবে।'

এলা দীর্ঘকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'কি বলিলে?'

প্রদ্যুম্ন রাজকীয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, 'আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। এখন চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেল, বিবাহ করিবে, না বীজ ভক্ষণ করিবে?'

স্বপ্নের অবরুদ্ধ আকুলতা এতক্ষণে বন্যার মত নামিয়া আসিল, দলিতাঞ্জন চক্ষু দুটি ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন বাতায়নের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'গ্রহণ ছাড়িতে

এখনও বিলম্ব আছে। ততক্ষণ তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিলাম।'

বর্ষণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চমকের মত হাসি হাসিয়া এলা বলিল, 'বর্ব্বর।'

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬